ইউনিট ৬

জনসংখ্যা
(Population)

ভূমিকা

জনসংখ্যা যে কোনো দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। জনমিতিক, রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে জনসংখ্যার আকারগত বৈশিষ্ট্যের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। কোনো দেশের আয়তন এবং সম্পদের সাথে জনসংখ্যার আকার সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে সে দেশ দ্রুত উন্নতি লাভ করে। ঠিক তেমনি জনসংখ্যা কম হলে পর্যাপ্ত সম্পদ থাকার পরও জনশক্তির অভাব দেখা দেয়। আবার সম্পদের তুলনায় অধিক জনসংখ্যা হলে তা দেশের জন্য বিভিন্ন সমস্যা তৈরি করে। তাই বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা পরিবর্তনের ধারা, ঘনত্ব, বন্টনের নিয়ামক, প্রভাব ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। একই সাথে বিশ্ব জনসংখ্যার পাশাপাশি বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা, সমস্যা ও সমাধানের উপায় জানা জরুরি। বিশ্বায়ন এবং যোগাযোগ ও প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে অতিরিক্ত জনবহুল অঞ্চল থেকে জনঘাটতি অঞ্চলে ঘটছে অভিবাসন। বৈশ্বিক পর্যায়ে যে অভিবাসন ঘটছে তার প্রভাব পড়েছে আমাদের দেশেও। এদেশের মানুষও প্রতিনিয়ত দেশের অভ্যন্তরে এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মের সন্ধানে ছুটে যাচ্ছে। এ সকল অভিবাসী নিজেদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

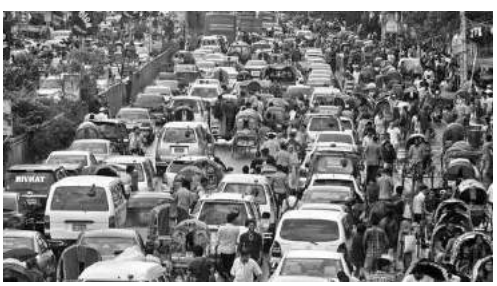

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৬.১ : বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা এবং পরিবর্তনের ধারা
পাঠ - ৬.২ : জনসংখ্যা বন্টনে নিয়ামকসমূহ
পাঠ - ৬.৩ : বিশ্ব জনসংখ্যার বন্টন ও ঘনত্ব
পাঠ - ৬.৪ : অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণ ও প্রভাব
পাঠ - ৬.৫ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা
পাঠ - ৬.৬ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সৃষ্ট সমস্যা ও সমাধানের উপায়
পাঠ - ৬.৭ : অভিবাসন ও প্রকারভেদ
পাঠ - ৬.৮ : বাংলাদেশের অভিবাসনের কারণ
পাঠ - ৬.৯ : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভিবাসীদের অবদান

পাঠ-৬.১ বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা এবং পরিবর্তনের ধারা
(World Present Population and Changing Trend)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- জনসংখ্যা পরিবর্তনের ধারা এবং নিয়ামক বলতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	জনসংখ্যা, আদমশুমারী, প্রাথমিক পর্যায়, মাধ্যমিক পর্যায়, আধুনিক পর্যায়।

জনসংখ্যা ও এর পরিবর্তন

জনসংখ্যা শব্দটি আমাদের কাছে সুপরিচিত। ভৌগোলিক অর্থে জনসংখ্যা বলতে একটি নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড বা অঞ্চলে বসবাসকারী এবং পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত লোকজনকে বুঝানো হয়ে থাকে। বিশ্বের এই জনসংখ্যা কখনো স্থির থাকেনি বরং কালক্রমে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। কখনো ধীর গতিতে আবার কখনো দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বাড়ছে। সময়ের সাথে সাথে জনসংখ্যা পরিবর্তনের তারতম্য হচ্ছে। আর এই তারতম্যই হচ্ছে জনসংখ্যা পরিবর্তনের ধারা।

কোনো অঞ্চল বা দেশের জনসংখ্যা জানার জন্য তা গণনা করতে হয়। এই জনসংখ্যা গণনাকে সাধারণত **আদমশুমারী** বা Population Census বলে। বর্তমানে বিশ্বে পাঁচ বা দশ বছর ব্যবধানে জাতীয়ভাবে জনসংখ্যা গণনা করার নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। আমাদের দেশেও প্রতি দশ বছর পর পর জনসংখ্যা গণনা করা হয়ে থাকে। বিশ্বে আধুনিক আদমশুমারী চালু হয় সপ্তদশ শতকে। বর্তমান প্রযুক্তি নির্ভর যুগে প্রতিটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনার জন্য জনসংখ্যা গণনাকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। সঠিক জনসংখ্যার হিসাব দেশের আঞ্চলিক এবং জাতীয় পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

বিশ্বে ১৬৫০ সালে জনসংখ্যা ছিল ৫১.৮ কোটি যা ১৮৫০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১১৬.৩ কোটিতে। ১৬৫০ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে অর্থাৎ দুইশত বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুনেরও বেশি হয়। ১৯০০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১৬১ কোটি এবং ১৯৯৯ সালে ১২ অক্টোবর তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৬০০কোটি বা ৬ বিলিয়ন। এই ৬০০ কোটি পৌঁছানোর দিনটিকে **Six Billion Day** হিসেবে পালন করা হয়। ২০১৪ সালের মাঝামাঝিতে পৃথিবীর জনসংখ্যা ৭২৩.৮ কোটিতে পৌঁছায়। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি চিত্র সারণি-৬.১.১ এ তুলে ধরা হলো।

সারণি-৬.১.১: পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা

সাল	জনসংখ্যা (কোটি)
১৬৫০	৫১.৮
১৭৫০	৭৪.৯
১৮৫০	১১৬.৩
১৯০০	১৬১.০
১৯৫০	২৫১.৯
২০০০	৬০৭.০
২০১৪	৭২৩.৮

সূত্রঃ তাহা (১৯৮৯), জনসংখ্যা ও জনপদ ভূগোল এবং পিআরবি-২০১৪

আবার আমরা যদি ১৯৫০ সালের পর থেকে বিশ্বের জনসংখ্যা পরিবর্তনের হার দেখি তাহলে দেখা যাবে যে, বিশ্বের জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে। ১৯৫০ সাল থেকে ২০১৪ সালের মধ্য পর্যন্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সারণি-৬.১.২ এ উল্লেখ করা হয়েছে। সারণি-৬.১.২ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মাত্র ৬০ বছরে বিশ্বের জনসংখ্যা প্রায় তিনগুণ হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ৯৬২.৪ কোটিতে দাঁড়াবে।

সারণি-৬.১.২: সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বের জনসংখ্যা

সাল	জনসংখ্যা (কোটি)
১৯৫০	২৫১.৯
১৯৬০	২৯৮.২
১৯৭০	৩৬৯.২
১৯৮০	৪৪৩.৫
১৯৯০	৫২৬.৩
২০০০	৬০৭.০
২০১৪	৭২৩.৮

সূত্র : ইউএন সেনসাস ব্যুরো-২০১০ এবং পিআরবি-২০১৪

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা সকল দেশে সমান নয়। উন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা ধীর। তবে অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যা খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৪ সালের মধ্য পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব, উন্নত দেশ এবং অনুন্নত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সারণি-৬.১.৩ এ উল্লেখ করা হলো।

সারণি-৬.১.৩: সমগ্র বিশ্ব, উন্নত দেশ এবং অনুন্নত দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

অঞ্চল	জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার (শতকরা)		
	১৯৬০-৬৫	১৯৮০-৮৫	২০১৪
সমগ্র বিশ্ব	১.৯৯	১.৭০	১.২
উন্নত দেশ	১.১৯	০.৬৮	০.১
অনুন্নত দেশ	২.৩৩	২.০৮	২.৪

সূত্র : United Nations estimates and projections as assessed in1980-1990 and Population References Bureaus- 2014

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারাকে ৩টি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। এগুলো হলো-

১. প্রাথমিক পর্যায়
২. মাধ্যমিক পর্যায় এবং
৩. আধুনিক পর্যায়।

১. **প্রাথমিক পর্যায় (Initial Stage) :** প্রাথমিক পর্যায় বলতে প্রাচীনকাল থেকে ১৬৫০ সাল পর্যন্ত সময়কে বুঝানো হয়ে থাকে। এ সময় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং সংখ্যা উভয়ই ছিল খুব কম। তবে জন্ম ও মৃত্যুহার ছিল খুব বেশি। মৃত্যুহার বেশি হওয়ার কারণ ছিল রোগব্যাধি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এই সব মোকাবেলা করার মতো সক্ষমতা সে সময়কার জনগণ অর্জন করতে পারেনি।

২. **মাধ্যমিক পর্যায় (Middle Stage) :** ১৬৫০ সালের পর থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত সময়কে মাধ্যমিক পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ সময় কিছু কিছু অঞ্চলে বিশেষ করে ইউরোপ, আমেরিকায় চিকিৎসা পদ্ধতি উন্নতির জন্য জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৩. **আধুনিক পর্যায় (Modern Stage) :** ১৯০০ সালের পর থেকে আধুনিক পর্যায়ভুক্ত। এ পর্যায়ে উন্নত দেশগুলোতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। অনুন্নত দেশগুলোতে জন্মহার এখনো বেশি। তবে কিছু কিছু উন্নয়নশীল দেশ জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা এবং বৃদ্ধির ধারা উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত সব ধরনের রাষ্ট্রই নিয়ন্ত্রনে চেষ্টা করছে।

জনসংখ্যা পরিবর্তনের নিয়ামক (Factors of Population Change)

জনসংখ্যার আকার প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। সাধারনত জনসংখ্যা পরিবর্তনের তিনটি নিয়ামক রয়েছে। এগুলো হলো-

ক. জন্মহার
খ. মৃত্যুহার এবং
গ. অভিবাসন।

ক. **জন্মহার (Birth Rate) :** জনসংখ্যা পরিবর্তনের প্রধান নিয়ামক হলো জন্মহার। মানুষের মরণশীলতার কারণে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তা সন্তান জন্মের মাধ্যমে পূরণ হয়। কোনো নির্দিষ্ট একটি বছরে প্রতি হাজার নারীর সন্তান জন্মদানের মোট সংখ্যাকে জন্মহার বলে। সাধারণত ১৫ থেকে ৪৫ বা ১৫ থেকে ৪৯ বছর বয়স পর্যন্ত নারীদের প্রজনন ক্ষমতা(Fertility) থাকে। এটি নির্ণয় করা হয় নিম্নোক্তভাবে-

$$\text{সাধারণ জন্মহার} = \frac{\text{নির্দিষ্ট বছরে জন্মলাভকারী সন্তান}}{\text{নির্দিষ্ট বছরে প্রজননক্ষম নারীর সংখ্যা}} \times \text{১০০০}$$

তবে প্রজননশীলতা পরিমাপের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি স্থুল জন্মহার বা Crude Birth Rate (**CBR**)। এ পদ্ধতিতে কোনো বছরে জন্মিত সন্তানের মোট সংখ্যাকে উক্ত বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করে নির্ণয় করা হয়। স্থুল জন্মহার নির্ণয়ের জন্য কোনো দেশ বা অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা এবং ঐ বছরে জন্মিত সন্তান সংখ্যা জানা থাকা প্রয়োজন।

স্থূল জন্মহার নির্ণয় করা হয় নিম্নোক্তভাবে-

$$\text{স্থূল জন্মহার} = \frac{\text{কোনো বছরে জন্মিত সন্তানের মোট সংখ্যা}}{\text{বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা}} \times \text{১০০০}$$

খ. মৃত্যুহার (Death Rate) : মরণশীলতাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। কিন্তু জন্মহার অপেক্ষা মৃত্যুহার কম হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আর মরণশীলতা পরিমাপের বহুল প্রচলিত পদ্ধতি স্থূল মৃত্যুহার বা Crude Death Rate (**CDR**)। নির্দিষ্ট কোনো বছরে মৃত্যুবরণকারীদের মোট সংখ্যাকে উক্ত বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে স্থূল মৃত্যুহার পাওয়া যায়। স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয়ের জন্য কোনো দেশ বা অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা এবং ঐ বছরে মৃতের সংখ্যা জানা থাকা প্রয়োজন। স্থূল মৃত্যুহার নির্ণয় করা হয় নিম্নোক্তভাবে-

$$\text{স্থূল মৃত্যুহার} = \frac{\text{কোনো বছরে মৃত্যুবরণকারী মোট সংখ্যা}}{\text{বছরের মধ্যকালীন মোট জনসংখ্যা}} \times \text{১০০০}$$

গ. অভিবাসন (Migration) : মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য গমন করে থাকে। এরূপ এক বা একাধিক বছরের জন্য বাসস্থানের পরিবর্তনই অভিবাসন। এটি জনসংখ্যা পরিবর্তনের অন্যতম একটি নিয়ামক। আমরা পাঠ ৬.৭ এ অভিবাসন সর্ম্পকে বিস্তারিত জানতে পারব।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, কোনো দেশ বা অঞ্চলের জনসংখ্যা পরিবর্তন হবে কী না বা কী ধরনের পরিবর্তন হবে তা নির্ভর করে সেখানকার জন্মহার, মৃত্যুহার এবং অভিবাসনের উপর।

শিক্ষার্থীর কাজ	জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভিন্ন পর্যায়গুলো সময়কালসহ ছকবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ :

জনসংখ্যা বলতে কোনো নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড বা অঞ্চলে বসবাসকারী পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত লোকজনকে বুঝায়। বিশ্বের এই জনসংখ্যা কখনো স্থির না থেকে সর্বদা পরিবর্তিত হয়েছে। জনসংখ্যা নির্ণয় করা হয় গণনা দ্বারা যা বর্তমানে আদমশুমারী নামে পরিচিত। ১৬৫০ সালে পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল ৫১.৮ কোটি যা ১৯৯৯ সালে ৬০০ কোটিতে পৌঁছে। ২০১৪ সালের মাঝামাঝিতে বিশ্বের জনসংখ্যা হয় ৭২৩.৮ কোটি। পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারাকে ৩টি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো- ১. প্রাথমিক পর্যায়, ২. মাধ্যমিক পর্যায় এবং ৩. আধুনিক পর্যায়। আর জনসংখ্যা পরিবর্তনের নিয়ামক তিনটি হলো- জন্মহার, মৃত্যুহার এবং অভিবাসন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বিশ্বের আধুনিক আদমশুমারী চালু হয় কোন শতকে?
(ক) পঞ্চদশ (খ) ষোড়শ (গ) সপ্তদশ (ঘ) অষ্টাদশ

২. পৃথিবীর জনসংখ্যা ৬ বিলিয়নে পৌঁছায় কত সালে?
(ক) ১৮৯৯ (খ) ১৯৩৩ (গ) ১৯৬৬ (ঘ) ১৯৯৯

৩. বিশ্বের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে-
i. উন্নত দেশগুলোতে ii. অনুন্নত দেশগুলোতে iii. উন্নয়নশীল দেশগুলোতে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii

৪. পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারাকে কয়টি পর্যায়ে ভাগ করা যায়?
(ক) ১টি (খ) ২টি (গ) ৩টি (ঘ) ৪টি

পাঠ-৬.২ জনসংখ্যা বন্টনে নিয়ামকসমূহ
(Factors of Population Distribution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা বন্টনে প্রভাব বিস্তারকারী প্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহ জানতে পারবেন এবং
- জনসংখ্যা বন্টনে প্রভাব বিস্তারকারী অপ্রাকৃতিক নিয়ামকসমূহ বলতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	প্রাকৃতিক নিয়ামক, অপ্রাকৃতিক নিয়ামক।

জনসংখ্যা বন্টনে নিয়ামকসমূহ

আমরা যদি আমাদের চারপাশে দেখি তাহলে দেখব যে, সব এলাকায় সমান জনসংখ্যা নেই। ঠিক তেমনি পৃথিবীর জনসংখ্যার বন্টনও সর্বত্র সমান নয়। স্থানভেদে এই জনসংখ্যা বন্টনের তারতম্য রয়েছে। জনসংখ্যা বন্টনে কতকগুলো নিয়ামক কাজ করে। এই নিয়ামকগুলো জীবনধারণের জন্য অনুকূল হলে সেখানে মানুষের সংখ্যাধিক্য থাকে। আবার প্রতিকূল অবস্থায় জনসংখ্যার পরিমাণ কমে যায়। পৃথিবীর জনসংখ্যা বন্টনে যেসব নিয়ামক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে সেগুলোকে আমরা প্রধানত দুইভাগে ভাগ করতে পারি। যথা-
ক. প্রাকৃতিক নিয়ামক এবং খ. অপ্রাকৃতিক নিয়ামক।

ক. প্রাকৃতিক নিয়ামক (Physical Factors)

১. **জলবায়ু :** জনসংখ্যা বন্টনে জলবায়ু একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। পৃথিবীর অনুকূল জলবায়ু অঞ্চলে জনসংখ্যা বেশি। অপরদিকে প্রতিকূল জলবায়ু অঞ্চলে জনসংখ্যা কম। মরুভূমি, শীতল বরফাচ্ছিত বা গ্রীষ্মকালীন জলাবদ্ধ অঞ্চলে জনসংখ্যা কম। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সাহারা ও কালাহারি মরুভূমিতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১ জনের কম লোক বাস করে। অপরদিকে অনুকূল জলবায়ুর কারণে বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০২৮ জন লোক বসবাস করে।

২. **ভূমিরূপ :** পৃথিবীর সমভূমি অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। সমতল ভূমিই মানুষ বসবাসের আদর্শ স্থান। সমতল ভূমিতে কৃষিকাজ, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ যাবতীয় কার্যাবলি সহজেই সম্পন্ন করা যায়। আবার মরুভূমি বা পার্বত্য অঞ্চলে জনজীবন কষ্টকর বলে জনসংখ্যার ঘনত্ব একেবারেই কম।

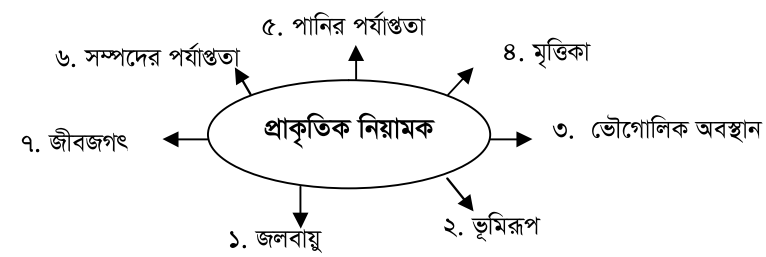

৩. **ভৌগোলিক অবস্থান :** ভৌগোলিক অবস্থানের উপর জনসংখ্যার বন্টন নির্ভরশীল। নিম্ন অক্ষাংশে অবস্থিত দেশসমূহে অতিরিক্ত উত্তাপ ও বৃষ্টিপাত এবং উচ্চ অক্ষাংশে অবস্থিত দেশসমূহে প্রচন্ড শৈত্যের কারণে কৃষিকাজ তেমন হয় না। ফলে ঐ সকল অঞ্চলে জনবসতি খুবই কম, আবার কোথাও কোথাও নেই বললেই চলে। পরিমিত বৃষ্টিপাত ও উত্তাপের জন্য মধ্য অক্ষাংশের দেশগুলিতে জনবসতি ঘন।

৪. **মৃত্তিকা :** উর্বর মৃত্তিকা জনসংখ্যা বন্টনের একটি অন্যতম নিয়ামক। কৃষিভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য উর্বর মৃত্তিকার প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। যেসব দেশের মৃত্তিকা উর্বর (যেমন- বাংলাদেশ, ভারত, চীন প্রভৃতি) সেসব দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি।

৫. **পানির প্রাচুর্যতা :** পর্যাপ্ত পানি জনসংখ্যা বন্টনের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। সুদূর প্রাচীনকাল থেকেই পানিকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠেছে। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি নীল নদকে কেন্দ্র করে মিশরীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছে।

৬. **সম্পদের পর্যাপ্ততা :** বিভিন্ন প্রকার সম্পদ যেমন- শক্তি সম্পদ, খনিজ সম্পদ, বনজ সম্পদ ইত্যাদি জনসংখ্যা বন্টনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। এসব সম্পদকে প্রক্রিয়াজাত করে জনগণ জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

৭. **জীবজগৎ :** বিশ্ব জনসংখ্যা বন্টনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ এবং প্রাণির বিন্যাস ধারা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। অরণ্যভূমি, তৃণভূমি, কাঁটাযুক্ত ঝোপঝাড় ইত্যাদি জনসংখ্যা বিস্তারের অনুকূল নয়। অন্যদিকে প্রেইরি অঞ্চল, আদি আমেরিকান এবং পরবর্তিতে গম চাষীদের জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

খ. অপ্রাকৃতিক নিয়ামক (Non Physical Factors)

১. **কর্মসংস্থানের সুযোগ :** মানুষের জীবনধারণের জন্য কর্মসংস্থান অপরিহার্য। যে সকল অঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে সে সকল স্থান স্বভাবতই জনসংখ্যা বন্টনে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ- ঢাকা, মুম্বাই, টোকিওতে কর্মসংস্থানের সুযোগ বেশি থাকায় এসব স্থানে বসবাসের জন্য জনসংখ্যা অধিক আকৃষ্ট হয়।

২. **শিল্প ও বাণিজ্য :** বিশ্বব্যাপী শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক। শিল্প ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোতে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মযুক্ত লোক বসবাস করে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম শহর।

৩. **অভিগমন :** মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করে থাকে। অভিগমন সাধারণত অনুন্নত দেশগুলো থেকে উন্নত দেশগুলোতে হয়ে থাকে যা বিশ্ব জনসংখ্যা বন্টনকে প্রভাবিত করে।

৪. **প্রযুক্তি :** প্রযুক্তিগত উন্নয়ন জনসংখ্যার বন্টনকে প্রভাবিত করে থাকে। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে যা বিশ্ব জনসংখ্যা বন্টনের একটি নিয়ামকে পরিণত হয়েছে।

৫. **অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধরণ :** অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের ধরণ জনসংখ্যা বন্টনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। যেমন- নিবিড় কৃষিভিত্তিক এলাকায় জনসংখ্যার আধিক্য দেখা যায়।

৬. **ঐতিহাসিক :** মানুষ সাধারণত নিজ নিজ আবাসস্থল পরিবর্তন করতে চায় না। অধিকাংশ মানুষ পৈতৃক ভিটায় বসবাস করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। এ কারণে বিশেষ করে গ্রামীন এলাকায় জনসংখ্যা বাড়তে থাকে।

৭. **রাজনৈতিক :** রাজনৈতিক কারণেও কোনো অঞ্চল বা দেশে জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে সৈন্যের প্রয়োজনে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জার্মানির সকল পিতা-মাতাকে অধিক হারে সন্তান জন্মদানের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য এ ধরনের রাজনৈতিক কারণ এখন প্রতীয়মান হয় না। তবে অনেক দেশে আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা একবারেই কম হওয়া এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্যের কোটায় নেমে যাওয়ায় অধিক সন্তানের জন্য উৎসাহিত করা হয়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অভিবাসনকে উৎসাহিতও করা হয়।

৮. **সরকারি নীতি :** সরকারের গৃহীত সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির ফলে জনসংখ্যা বন্টন প্রভাবিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	জনসংখ্যা বন্টনের প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক নিয়ামকগুলো ছকবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ :

পৃথিবীর সর্বত্র জনসংখ্যা বন্টন সমান নয়। জনসংখ্যা বন্টনে অনেকগুলো নিয়ামক কাজ করে থাকে। এই নিয়ামকগুলোকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়। যথা- প্রাকৃতিক নিয়ামক এবং অপ্রাকৃতিক নিয়ামক। প্রাকৃতিক নিয়ামকের মধ্যে রয়েছে- জলবায়ু, ভূমিরূপ, মৃত্তিকা, ভৌগোলিক অবস্থান, পানি ও সম্পদের পর্যাপ্ততা, জীবজগৎ প্রভৃতি। অপ্রাকৃতিক নিয়ামকগুলোর মধ্যে রয়েছে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, কর্মসংস্থান, শিল্প-বাণিজ্য, অভিগমন, প্রযুক্তি, সরকারি নীতি, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি। প্রাকৃতিক এবং অপ্রাকৃতিক এসব নিয়ামকগুলো সমন্বিতভাবে জনসংখ্যা বন্টনকে প্রভাবিত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জনসংখ্যা বন্টনের নিয়ামকসমূহকে প্রধানত কয়ভাবে ভাগ করা যায়?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২. জনসংখ্যা বন্টনের অপ্রাকৃতিক নিয়ামক-
i. জলবায়ু ii. যোগাযোগ ব্যবস্থা iii. অভিগমন
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i (খ) i ও ii (গ) ii ও iii

৩. নিচের কোন ভূমিরূপটি বসবাসের আদর্শ?
(ক) সমতলভূমি (খ) পাহাড়ি এলাকা (গ) মরুভূমি (ঘ) চরাঞ্চল

পাঠ-৬.৩ বিশ্ব জনসংখ্যার বন্টন ও ঘনত্ব (World Population Distribution and Density)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিশ্ব জনসংখ্যার বন্টন সম্পর্কে জানবেন এবং
- বিশ্ব জনসংখ্যার ঘনত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	জনসংখ্যা বন্টন, জনসংখ্যা ঘনত্ব, নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল, পরিমিত জনসংখ্যা অঞ্চল, বিরল জনসংখ্যা অঞ্চল, প্রায় জনহীন অঞ্চল।

বিশ্ব জনসংখ্যার বন্টন ও ঘনত্ব

পৃথিবীর জনসংখ্যার বন্টন ও ঘনত্বের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বিভিন্নতা দেখা যায়। কোথাও রয়েছে বিপুল সংখ্যক মানুষের আবাস আবার কোথাও জনমানবহীন। ভূ-পৃষ্ঠের ৫০-৬০ ভাগ এলাকায় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা মাত্র ৫ ভাগ লোক বাস করে। আবার পৃথিবীর মোট স্থলভাগের শতকরা ৫ ভাগ এলাকায় অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা বসবাস করে।

জনসংখ্যা বন্টন (Population Distribution) : প্রথমে আমরা জানব জনসংখ্যা বন্টন কী? জনসংখ্যার বন্টন হলো স্থানভেদে জনসংখ্যার বিন্যাস অর্থাৎ কোনো স্থানে জনসংখ্যা বসবাসের ধরণই জনসংখ্যা বন্টন। বিশ্বের সর্বত্র জনসংখ্যা সমভাবে বন্টিত নয়। পৃথিবীর অধিক জনবসতি অঞ্চলগুলোর মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, উত্তর আমেরিকার দেশসমূহ। মহাদেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা বাস করে এশিয়ায়। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি আফ্রিকায় ২.৫% এবং ইউরোপে ০.০%। সারণি-৬.৩.১ এ ২০১৪ সালের মধ্য পর্যন্ত বিশ্ব জনসংখ্যার মহাদেশভিত্তিক বন্টন দেখানো হয়েছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনবহুল দেশ রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র। আর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে চীন এবং ভারত সর্বাপেক্ষা জনবহুল। ১০০ মিলিয়নের অধিক জনসংখ্যা বাস করে এ ধরনের দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে চীন, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নাইজেরিয়া এবং মেক্সিকো। সারণি-৬.৩.২ এ বিশ্বের কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার বন্টন দেখানো হলো।

সারণি-৬.৩.১: বিশ্ব জনসংখ্যার মহাদেশভিত্তিক বন্টন

মহাদেশ	জনসংখ্যা (কোটি)	বৃদ্ধির হার (%)
এশিয়া	৪৩৫.১	১.১
আফ্রিকা	১১৩.৬	২.৫
ইউরোপ	৭৪.১	০.০
দক্ষিণ আমেরিকা	৪১.০	১.১
উত্তর আমেরিকা	৩৫.৩	০.৪
ওশেনিয়া	৩৯.০	১.১

উৎস: Population References Bureau (PRB)-2014

সারণি-৬.৩.২: বিশ্বের কয়েকটি দেশের জনসংখ্যার বন্টন

দেশ	জনসংখ্যা(মিলিয়ন)
চীন	১৩৬৪
ভারত	১২৯৬
যুক্তরাষ্ট্র	৩১৮
ইন্দোনেশিয়া	২৫১
ব্রাজিল	২০৩
পাকিস্তান	১৯৪
নাইজেরিয়া	১৭৭
বাংলাদেশ	১৫৮
রাশিয়া	১৪৪
জাপান	১২৭

উৎস: Population References Bureau (PRB)-2014

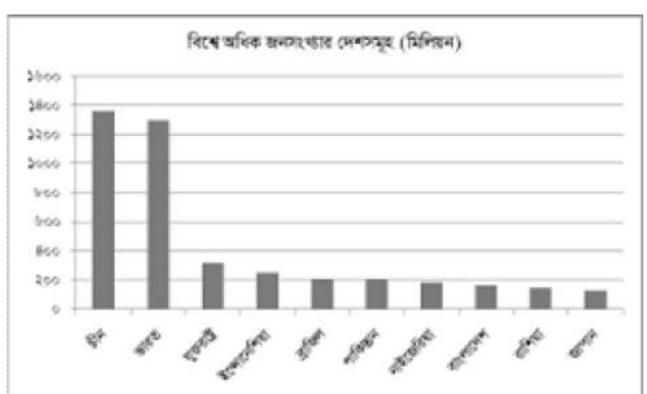

জনসংখ্যার ঘনত্ব (Population Density) : জনসংখ্যার ঘনত্ব হলো কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা দেশে সংঘবদ্ধ অবস্থানের নিবিড়তা। কোনো স্থান বা দেশের আয়তন দ্বারা মোট জনসংখ্যাকে ভাগ করে জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করা যায়। জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করা হয় এভাবে-

$$\text{জনসংখ্যার ঘনত্ব} = \frac{\text{মোট জনসংখ্যা}}{\text{মোট আয়তন}}$$

উপরের সূত্র অনুযায়ী উদাহরণ হিসেবে আমরা বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করতে পারি। ধরি, বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫,১৭,০০,০০০ জন এবং আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার।

$$\text{সুতরাং জনসংখ্যার ঘনত্ব} = \frac{\text{১৫,১৭,০০,০০০}}{\text{১,৪৭,৫৭০}} = \text{১০২৮ জন (প্রতি বর্গকিলোমিটার)।}$$

বাংলাদেশ বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। এছাড়া সারণি-৬.৩.৩ এ বর্ণিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দেশভিত্তিক জনসংখ্যা ঘনত্বে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। অধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাহরাইন, মাল্টা, বারমুডা অন্যতম। এরপরই ভারত, জাপান, যুক্তরাজ্যের অবস্থান। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে পৃথিবীকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা-

সারণি-৬.৩.৩ : দেশভিত্তিক বিশ্ব জনসংখ্যার ঘনত্ব

দেশের নাম	ঘনত্ব (ব.কি.মি)	দেশের নাম	ঘনত্ব (ব.কি.মি)
সুইজারল্যান্ড	৭৪	চীন	১৪৫
ফ্রান্স	১২১	ভারত	৪২৬
মাল্টা	১৩৩৬	সৌদি আরব	১৪
কানাডা	৪	ইসরাইল	৩৮০
ব্রাজিল	২৪	জাপান	৩৪৯
যুক্তরাজ্য	২৬৭	থাইল্যান্ড	১৩২
যুক্তরাষ্ট্র	৩৫	অস্ট্রেলিয়া	৩
নেপাল	১৯৬	ইন্দোনেশিয়া	১৪০
জার্মানি	২৩২	কুয়েত	১৯৫
বাহরাইন	১৭৬৯	বারমুডা	১৩০৪

সূত্র : World Development Report-2014

১. নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল (Intensive Populated Region)
২. পরিমিত জনসংখ্যা অঞ্চল (Moderate Populated Region)
৩. বিরল জনসংখ্যা অঞ্চল (Sparsely Populated Region) এবং
৪. প্রায় জনহীন অঞ্চল (Nearly Uninhabited Region)।

১. **নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল :** যেসব অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০০ জনের বেশি লোক বাস করে সে সকল অঞ্চলকে নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল বলে। বাংলাদেশ, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, যুক্তরাজ্য, জাপান, জার্মান প্রভৃতি দেশ নিবিড় জনসংখ্যা অধ্যুষিত।
২. **পরিমিত জনসংখ্যা অঞ্চল :** কোনো অঞ্চলে যদি প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫০-১০০ জন লোক বাস করে তবে সেই অঞ্চলকে পরিমিত জনসংখ্যা অঞ্চল বলে। যেমন- তুরস্ক, ইরাক, ইরান, চীনের উচ্চভূমি, যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ স্থান, আফ্রিকার পূর্ব উপকূল।
৩. **বিরল জনসংখ্যা অঞ্চল :** যেসব অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২-৫০ জন লোক বাস করে সেগুলোই বিরল জনবসতি অঞ্চল। উত্তর আমেরিকার প্রেইরি, দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস, ইউরেশিয়ার স্টেপস্ এর অন্তর্ভুক্ত।
৪. **প্রায় জনহীন অঞ্চল :** এ ধরনের অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে একজনের কম লোক বাস করে। সাহারা ও কালাহারি মরুভূমি, আমাজান উপত্যকা, হিমালয়, রকি ও আন্দিজ পর্বতমালা এ ধরনের অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভারতের আয়তন ৩২,৮৭,৫৯০ বর্গকিলোমিটার এবং মোট জনসংখ্যা ১২১,০১,৯৩,৪২২ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ণয় করুন।

সারসংক্ষেপ :

জনসংখ্যার বন্টন হলো বিভিন্ন স্থানভেদে জনসংখ্যার বিন্যাস। আর জনসংখ্যার ঘনত্ব বলতে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বা বর্গমাইলে বসবাসকারী জনসংখ্যাকে বুঝায়। অঞ্চল হিসেবে দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া, পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ এবং পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া, উত্তর আমেরিকায় জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে জনসংখ্যা বেশি রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে চীন এবং ভারতে জনসংখ্যা অধিক। বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে। জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে পৃথিবীকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো- নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল, পরিমিত জনসংখ্যা অঞ্চল, বিরল জনসংখ্যা এবং প্রায় জনহীন অঞ্চল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন মহাদেশে সবচেয়ে বেশি লোক বাস করে?
(ক) এশিয়া (খ) ইউরোপ (গ) উত্তর আমেরিকা (ঘ) আফ্রিকা

২. নিচের কোনটি সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ?
(ক) জাপান (খ) আফ্রিকা (গ) চীন (ঘ) বাংলাদেশ

পাঠ-৬.৪ অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণ ও প্রভাব
(Causes and Effects of Over Population)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভূমি-মানুষ অনুপাত নির্ণয় করতে পারবেন;
- কাম্য জনসংখ্যা কী তা বলতে পারবেন এবং
- অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণ ও প্রভাব জানতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	কাম্য জনসংখ্যা, কার্যকর ভূমি, ভূমি-মানুষ অনুপাত, অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণ এবং সৃষ্ট প্রভাব।

অতিরিক্ত জনসংখ্যা

বিশ্বের কোনো কোনো অঞ্চলে তার ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি জনসংখ্যা পরিলক্ষিত হয়। আবার কোনো কোনো অঞ্চলে পরিমিত বা বিরল জনসংখ্যা এবং কোথাওবা প্রায় জনহীন এলাকা বিরাজমান। জনসংখ্যা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যা কোনো অঞ্চলের জন্য আশীর্বাদ হতে পারে আবার দুর্ভোগের কারণও হতে পারে। তবে অতিরিক্ত জনসংখ্যা হলেও তা যদি দক্ষ মানব শক্তিতে পরিণত করা যায় তাহলে দেশের জন্য কল্যাণকরও হতে পারে।

যে কোনো দেশের জন্য সম্পদ এবং জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য থাকা উচিত। যখন কোনো দেশের মোট জনসংখ্যা এবং কার্যকর ভূমির অনুপাতের মধ্যে ভারসাম্য থাকে তখন তাকে **কাম্য জনসংখ্যা** (Optimum Population) বলে। **কার্যকর ভূমি** বলতে যে সকল ভূমি মানুষের বিভিন্ন কাজে লাগে এবং উক্ত ভূমি সম্পদ সৃষ্টি করতে পারে তাকেই বুঝায়। ভূমি-মানুষের অনুপাতের মাধ্যমে কোনো দেশের জনপ্রতি ভূমির পরিমাণ জানা যায়। ভূমি-মানুষের অনুপাত নির্ণয় করা হয় নিম্নোক্তভাবে-

$$\text{ভূমি-মানুষের অনুপাত} = \frac{\text{মোট কার্যকর ভূমির আয়তন}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৫,১৭,০০,০০০ জন এবং কার্যকর ভূমির পরিমাণ ৩,৭৪,০০,০০০ একর। সুতরাং

$$\text{ভূমি-মানুষের অনুপাত} = \frac{৩,৭৪,০০,০০০}{১৫,১৭,০০,০০০}$$

$$= ০.২৪৬ \text{ একর (প্রায়)}$$

অর্থাৎ বাংলাদেশে প্রতি একজন মানুষের বিপরীতে ভূমির পরিমাণ মাত্র ০.২৪৬ একর (প্রায়)। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আমাদের দেশে ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা অধিক।

অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণ (Causes of Over Population)

যে সব এলাকায় বা দেশে মানুষের জীবনধারণের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা রয়েছে সাধারণত সে সব এলাকাতেই অধিক জনসংখ্যা বাস করে। প্রাকৃতিক, আর্থ-সামাজিকসহ বিভিন্ন কারণে কোনো দেশ বা অঞ্চলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা পরিলক্ষিত হয়। অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য যে সকল কারণ মূখ্য ভূমিকা পালন করে সেগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১. **ভূমিরূপ :** অতিরিক্ত জনসংখ্যার একটি অন্যতম কারণ হলো ভূমিরূপ। সাধারণত সমতল ভূমি অঞ্চলে অধিক জনসংখ্যা দেখা যায়। বিশ্বের যে সকল অঞ্চলে সমতল ভূমি রয়েছে সেসব এলাকায় কৃষিকাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা সহজে স্থাপন করা যায় বলে অধিক লোক বাস করে।

২. **মৃত্তিকা :** উর্বর মৃত্তিকা অঞ্চলে স্বভাবতই অধিক জনসংখ্যা বাস করে। এসব মৃত্তিকা অঞ্চলে ব্যাপক হারে কৃষি কর্মকান্ড হওয়ায় মানুষের খাবার সরবরাহ নিশ্চিত হয়। এছাড়া কৃষিভিত্তিক উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠে। আর এসব শিল্প-কারখানার চারপাশে অতিরিক্ত লোক সমাগম হয়।

৩. **জলবায়ু :** অনুকূল জলবায়ু অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড সম্পন্ন করা সহজ হওয়ায় অধিক জনসংখ্যা বাস করে। নাতিশীতোষ্ণ বা সমভাবাপন্ন অঞ্চলের দেশগুলোতে জনসংখ্যা তুলনামূলক বেশি।

৪. **প্রাকৃতিক সম্পদ :** অতিরিক্ত জনসংখ্যার একটি অন্যতম কারণ প্রাকৃতিক সম্পদ। কেননা, মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবহার করে জীবিকা নির্বাহ এবং শিল্পোন্নয়ন করে থাকে।

৫. **পানির পর্যাপ্ততা :** জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য পানি। পানির পর্যাপ্ততাকে কেন্দ্র করে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হয়ে থাকে। সাধারণত নদী অববাহিকা অঞ্চলে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা স্থাপন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার লাভ করায় অতিরিক্ত জনসংখ্যা পরিলক্ষিত হয়।

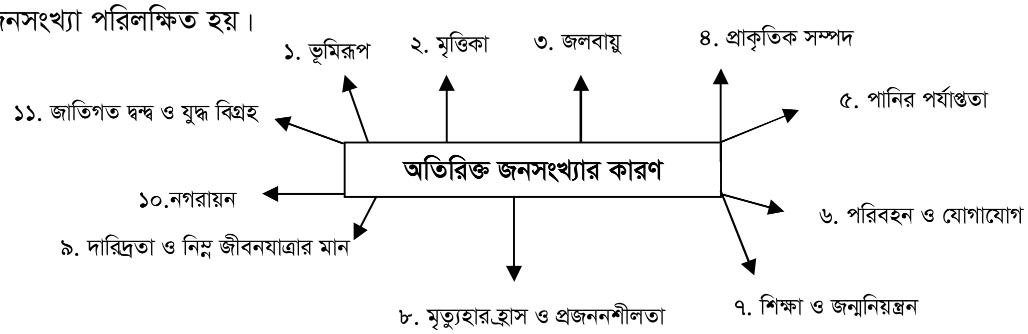

৬. **পরিবহন ও যোগাযোগ :** পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ হলে অধিক জনসমাগম হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত সারা দেশে সড়ক, রেল ও নৌ যোগাযোগ সহজ হওয়ায় সর্বত্র জনসংখ্যার চাপ বেশি।

৭. **শিক্ষা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ :** সাধারণত সুশিক্ষায় শিক্ষিত না হলে মানুষজন অধিক সন্তান গ্রহণ করে থাকে। শহরের তুলনায় গ্রামের লোকজন কম শিক্ষিত হওয়ায় গ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন না হওয়ায় জনসংখ্যাও অধিক।

৮. **মৃত্যুহার হ্রাস ও প্রজনশীলতা** : জনসংখ্যা অতিরিক্ত হওয়ার আরও একটি কারণ হলো মৃত্যুহার হ্রাস। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে। প্রজননশীলতার হার বেশি হলে তা জনসংখ্যার উপর প্রভাব ফেলে।

৯. **দারিদ্রতা ও নিম্ন জীবনযাত্রার মান** : দারিদ্রতা ও নিম্ন জীবনযাত্রার মান অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত দরিদ্র লোকজন এবং প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাসকারী লোকজন জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য শহর এলাকায় ছুটে যায়। ফলে শহরাঞ্চলে অতিরিক্ত জনসংখ্যা দেখা যায়।

১০. **নগরায়ন :** নগরায়নের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। নগরে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডে অসংখ্য মানুষ সম্পৃক্ত থাকে।

১১. **জাতিগত দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ বিগ্রহ :** জাতিগত দ্বন্দ্ব এবং যুদ্ধ বিগ্রহের কারণে লোকজন পাশ্ববর্তী দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। ফলে যে দেশে আশ্রয় গ্রহণ করে সে দেশে জনসংখ্যার চাপ পড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ- সিরিয়া এবং ইরাকে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে অনেক লোক পাশ্ববর্তী দেশে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটে গেছে।

অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত সৃষ্ট প্রভাব (Effects of Over Population)

কোনো দেশের জনসংখ্যা তার ধারণ ক্ষমতার বেশি হলে দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিশ্বব্যাপী অতিরিক্ত জনবহুল অঞ্চল বা দেশগুলোকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. **কৃষি জমি হ্রাস ও ভূমি খন্ডিতকরণ** : অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত কারণে কৃষি জমির উপর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য অবকাঠামো নির্মাণে কৃষি জমি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া খাদ্য চাহিদা মিটাতে গিয়ে অধিক ফসল চাষ করতে হয়। ফলে জমিতে বিভিন্ন প্রকার সার ও কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয় যাতে জমির গুণগত মান হ্রাস পেয়ে দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ে। আবার পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতিনিয়ত জমি খন্ড-বিখন্ড হচ্ছে। এতে জমির চারদিকে আইল দেওয়ার কারণে জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

২. **উন্মুক্ত স্থান হ্রাস এবং জলাশয় ও নদী ভরাট :** অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য উন্মুক্ত স্থান বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া যে সকল অঞ্চলে ছোট জলাশয় ও নদী রয়েছে সেগুলোর উভয় পাশে আবাস গড়ে তোলায় পরিবেশের ভারসাম্যে চাপ পড়ে।

৩. **বনভূমি হ্রাস :** স্বাভাবিকভাবেই অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে বনভূমির উপর চাপ পড়ে। ফলে বনের গাছপালা কর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করতে হয়।

৪. **খাদ্য ও পুষ্টির অভাব :** কোনো দেশের জনসংখ্যা অতিরিক্ত হলে যে সকল মৌলিক চাহিদার উপর প্রভাব পড়ে তার মধ্যে অন্যতম হলো খাদ্য ও পুষ্টি। আমরা যদি বিশ্বের অতিরিক্ত জনবহুল অঞ্চল বা শরণার্থী শিবির দেখি তাহলে দেখা যাবে যে সেখানে খাদ্য ও পুষ্টি ঘাটতি রয়েছে।

৫. **বাসস্থানের অভাব :** মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম হলো বাসস্থান। অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য বাসস্থান সংকুলান করতে না পারলে ঘিঞ্জি পরিবেশে বা খোলা আকাশের নিচে তাবু টেনে দিনানিপাত করতে হয়।

৬. **কর্মসংস্থানের অভাব ও মাথাপিছু আয় হ্রাস :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে চাকুরিতে পদ বাড়ছে না। এতে বেকার সমস্যা দেখা দেয়। একই সাথে মাথাপিছু আয় হ্রাস পায়। ফলে বেকারত্ব ও মাথাপিছু নিম্ন আয়ের কারণে সামাজিক অস্থিতিশীলতা দেখা যায়।

৭. **বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ও যাতায়াত ব্যবস্থা :** জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান পানি। বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ বিঘ্ন ঘটে। এছাড়া যাতায়াত ব্যবস্থাও প্রভাবিত হয়।

৮. **চিকিৎসা :** জনসংখ্যা অতিরিক্ত হলে সকল মানুষের চিকিৎসা সেবা প্রদান কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে চিকিৎসার জন্য দূর-দূরান্তে ছুটে যেতে হয়। আবার অনেকে সুচিকিৎসা না পেয়ে ধুকে ধুকে মৃত্যু পথযাত্রী হয়।

৯. **পরিবেশের উপর প্রভাব :** অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে চারপাশের পরিবেশের উপর প্রভাব পড়ে। পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, পাহাড় কর্তন, জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

এছাড়া অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি, সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্ন, জীবনযাত্রার মান হ্রাস এবং বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা দেখা দেয়। সাধারণত অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য বিভিন্ন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। তাই একটি দেশের সম্পদ এবং জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য থাকা উচিৎ।

শিক্ষার্থীর কাজ	অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে সৃষ্ট প্রভাবগুলো ছকবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ :

জনসংখ্যা এবং কার্যকর ভূমির অনুপাতে জনসংখ্যা অধিক হলে তা অতিরিক্ত জনসংখ্যা হিসেবে গণ্য করা হয়। কোনো অঞ্চল বা দেশের অতিরিক্ত জনসংখ্যার কতকগুলো কারণ রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো- ভূমিরূপ, জলবায়ু, মৃত্তিকা, প্রাকৃতিক সম্পদ, পানির পর্যাপ্ততা, পরিবহন ও যোগাযোগ, জন্মহার বৃদ্ধি ও মৃত্যুহার হ্রাস ইত্যাদি। অতিরিক্ত জনসংখ্যার ফলে কৃষিজমি, খাদ্য, বাসস্থান, কর্মসংস্থান, চিকিৎসাসহ বিভিন্ন চাহিদার উপর প্রভাব পড়ে। তাই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক দেশের জনসংখ্যা ও সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য থাকা উচিৎ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন ধরনের জলবায়ু অঞ্চলে অতিরিক্ত লোক বাস করে?
   (ক) চরমভাবাপন্ন (খ) সমভাবাপন্ন
   (গ) শীতল (ঘ) সবগুলো সঠিক

২. মানুষের মৌলিক চাাহিদা নয় কোনটি?
   (ক) খাদ্য (খ) চিকিৎসা
   (গ) বাসস্থান (ঘ) বিনোদন

৩. **কোনো দেশের সম্পদ এবং জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য থাকাকে কি বলে?**
   (ক) কাম্য জনসংখ্যা (খ) অতিরিক্ত জনসংখ্যা
   (গ) কার্যকর জনসংখ্যা (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৬.৫ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা
(Trend of Population Growth in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বিংশ শতাব্দী থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা বলতে পারবেন;
- গ্রামীন ও শহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বলতে পারবেন এবং
- ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

	মূখ্য শব্দ	জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা, গ্রামীন ও শহুরে জনসংখ্যা, জনসংখ্যার পূর্বাভাস।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা হলো কোনো নির্দিষ্ট সময়ে জনসংখ্যার সংখ্যাত্মক বা আকারগত পরিবর্তন। এ পরিবর্তনের ধারা থেকে জনমিতিক ভারসাম্য নিরূপণ করা যায়। জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির মধ্যে একটি ভারসাম্য থাকা আবশ্যক। কারণ এর সাথে আর্থ-সামাজিক বিষয় সম্পৃক্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও জনমিতিক প্রভাব ব্যাপক এবং দীর্ঘ মেয়াদী। বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে যা দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশ বিশ্বের ঘনবসতি অধ্যুষিত দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম এবং মুসলিম বিশ্বে তৃতীয়। এ দেশের জনসংখ্যা ঐতিহাসিককাল থেকেই পরিবর্তিত হয়েছে, যার ধারাবাহিকতা এখনো বিদ্যমান রয়েছে। তবে এ পরিবর্তনের হার কখনো কম আবার কখনো বেশি ছিল। ১৯১১ সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ০.৮৭ ভাগ। ১৯৫১ সালে কমে শতকরা ০.৫০ ভাগে দাঁড়ায়। আবার ১৯৬১ সালে বেড়ে গিয়ে শতকরা ২.২৬ ভাগে দাঁড়ায় এবং ২০১২ সালে কমে শতকরা ১.৩৬ ভাগে নেমে আসে। ১৯১১ সালে এদেশের জনসংখ্যা ছিল ৩.১৫ কোটি যা ২০১২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৫.১৭ কোটিতে পৌঁছেছে। সারণি-৬.৫.১ এ ১৯১১ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত এদেশের জনসংখ্যা এবং বৃদ্ধির হার দেখানো হলো। এছাড়া পিআরবি এর হিসাব অনুযায়ী ২০১৪ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১৫.৮০ কোটি।

সারণি-৬.৫.১: বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা এবং হার

সাল	জনসংখ্যা(কোটি)	বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
১৯১১	৩.১৫	০.৮৭
১৯২১	৩.৩২	০.৬০
১৯৩১	৩.৫৬	০.৭৪
১৯৪১	৪.১৯	১.৭০
১৯৫১	৪.৪২	০.৫০
১৯৬১	৫.৫২	২.২৬
১৯৭৪	৭.৬৪	২.৪৮
১৯৮১	৮.৯৯	২.৩১
১৯৯১	১১.১৪	২.১৭
২০০১	১৩.০৫	১.৪৮
২০১১	১৪.৪০	১.৩৭
২০১২	১৫.১৭	১.৩৬

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক- ২০১৩ এবং অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৫

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। আমরা যদি গ্রাম ও শহুরে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার দেখি তাহলে দেখব যে, ১৯৫০ সালে গ্রামীন জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১.৮৫% এবং শহুরে ৩.৮৬%। ২০১১ সালে এসে গ্রামীন জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার ১.৩১% এবং শহরে ৩.৪৮%। সারণি-৬.৫.২ এ গ্রামীন ও শহুরে জনসংখ্যা ও বৃদ্ধির হার দেখানো হলো।

সারণি ৬.৫.২ : শহুরে ও গ্রামীন জনসংখ্যা ও প্রবৃদ্ধির হার

সাল	শহুরে জনসংখ্যা		গ্রামীন জনসংখ্যা	
	জনসংখ্যা (কোটি)	প্রবৃদ্ধির হার (%)	জনসংখ্যা (কোটি)	প্রবৃদ্ধির হার (%)
১৯৫০	০.১৮	৩.৮৬	৪.০০	১.৮৫
১৯৬০	০.২৬	৬.১৫	৪.৮৫	২.১০
১৯৭০	০.৫০	৭.৫৮	৫.৯৯	১.৯১
১৯৮০	১.২২	৫.৬৮	৬.৯৯	১.৮১
১৯৯০	২.০৬	৩.৯৪	৮.৩৪	১.৮২
২০০০	২.৯৯	৩.৫৭	৯.৯	১.৫৯
২০১১	৩.৩৬	৩.৪৮	১১.০৫	১.৩১

উৎস: ইউএনএফপিএ-২০০৭ এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেট বুক-২০১৩

সারণি-৬.৫.২ থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, গ্রামীন জনসংখ্যার চেয়ে শহুরে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধি অধিক। ১৯৬০ সালের পর এ প্রবৃদ্ধির হার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে। ১৯৭০ সালের পর থেকে জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার কমতে শুরু করে ২০১১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা থেকে ভবিষ্যতে জনসংখ্যার পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা করা যায়। সারণি-৬.৫.৩ এ জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রকৃতি, বৃদ্ধির হার ও দ্বিগুণ হওয়ার সময় উল্লেখ করা হলো।

সারণি-৬.৫.৩: জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রকৃতি, বৃদ্ধি হার ও দ্বিগুণ হওয়ার সময়

জনসংখ্যার বৃদ্ধির প্রকৃতি	বাৎসরিক বৃদ্ধির শতকার হার	জনসংখ্যা দ্বিগুণ হওয়ার সময়
স্থিতিশীল জনসংখ্যা	কোনো বৃদ্ধি নেই	-
ধীর বৃদ্ধি	০.৫ এর কম	১৩৯ বৎসরের বেশি সময়
মধ্যম বৃদ্ধি	০.৫-১.০	১৩৯-৭০ বৎসর
দ্রুত বৃদ্ধি	১.০-১.৫	৭০-৪৭ বৎসর
অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি	১.৫-২.০	৪৭-৩৫ বৎসর
বিস্ফোরণমূলক বৃদ্ধি	২.০-২.৫	৩৫-২৮ বৎসর

উৎস : তাহা (১৯৮৯), জনসংখ্যা ও জনপদ ভূগোল

বাংলাদেশের ২০১২ সালের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৩৬%। এই হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে সারণি-৬.৫.৩ অনুযায়ী আগামী ৪৭-৭০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হবে বলে ধারণা করা যেতে পারে। তবে সরকার জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং সাফল্যও অর্জন করছে। ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরো কমে আসবে বলে আশা করা যায়। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন প্রচারণা ও কার্যক্রমের ফলে জনসচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিশ শতকে বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি চিত্র তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ :

কোনো অঞ্চল বা দেশের নির্দিষ্ট সময়ে জনসংখ্যার আকারগত বৃদ্ধি বা পরিবর্তনকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা বলে। আমাদের দেশে এই পরিবর্তন ধারার একটি ধারাবাহিকতা রয়েছে। হঠাৎ করে কখনো জনসংখ্যা কমে যায়নি। এছাড়া গ্রামীন জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার কমে শহরের জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে। বাংলাদেশে বর্তমান হারে জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে আগামী ৪৭-৭০ বছরের মধ্যে দ্বিগুণ হতে পারে। তবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকায় বৃদ্ধির হার হ্রাস পেতে পারে। এর ফলে জনসংখ্যা দ্বিগুণ ধীর গতিতে হবে বলে আশা করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ১৯১১ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত ছিল?

(ক) ২.৮৯ কোটি (খ) ৩.১৫ কোটি (গ) ৩.৩২ কোটি (ঘ) ৩.৫৬ কোটি

২. স্থিতিশীল জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার?

i. ০.৫ এর কম ii. ০.৫-১.০ এর মধ্যে iii. কোনো বৃদ্ধি নেই

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) iii (ঘ) কোনটিই নয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এদেশের জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রাম-শহরের জনসংখ্যাও পরিবর্তন হয়েছে। ফলে সার্বিকভাবে দেশের জনসংখ্যার কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে জনসংখ্যার ধরণে প্রভাব পড়ছে।

৩. ১৯৫০ সালে গ্রামীণ জনসংখ্যা কত ছিল?

(ক) ৪.০০ কোটি (খ) ৪.৮৫ কোটি (গ) ৫.৯৯ কোটি (ঘ) ৬.৯৯ কোটি

৪. ২০১২ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত ছিল?

(ক) ২.১৭ (খ) ২.৩১ (গ) ১.৪৮ (ঘ) ১.৩৬

পাঠ-৬.৬ বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সৃষ্ট সমস্যা ও সমাধানের উপায়
(Problems of Population Increases in Bangladesh & Way of Solution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কী ধরনের সমস্যা উদ্ভব হয় তা জানবেন এবং
- জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সমাধানের উপায় বলতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যা, সমস্যা সমাধানের উপায়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সৃষ্ট সমস্যা ও সমাধানের উপায়

১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের বাংলাদেশে বাস করছে প্রায় ১৫.১৭ কোটি লোক। বাংলাদেশ আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর তিন হাজার ভাগের একভাগ হলেও জনসংখ্যায় বিশ্বে অষ্টম। এখানে প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করছে প্রায় ১০২৮ জন। অথচ উন্নত দেশগুলো যেমন- যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৩৫ জন, যুক্তরাজ্যে ২৬৭ জন ও জাপানে ৩৪৯ জন লোক বাস করে। অর্থাৎ বাংলাদেশ জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।

যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে জনসংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। জনসংখ্যা একটি দেশের উন্নয়নের জন্য যেমন অপরিহার্য তেমনি অতিরিক্ত জনসংখ্যা বিভিন্ন প্রতিকূলতাও তৈরি করে। বাংলাদেশেও অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত কারণে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। নিম্নে বাংলাদেশে অতিরিক্ত জনসংখ্যাজনিত সৃষ্ট সমস্যা তুলে ধরা হলো। এখান থেকে আপনারা সহজেই ধারণা করতে পারবেন অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে বাংলাদেশকে কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

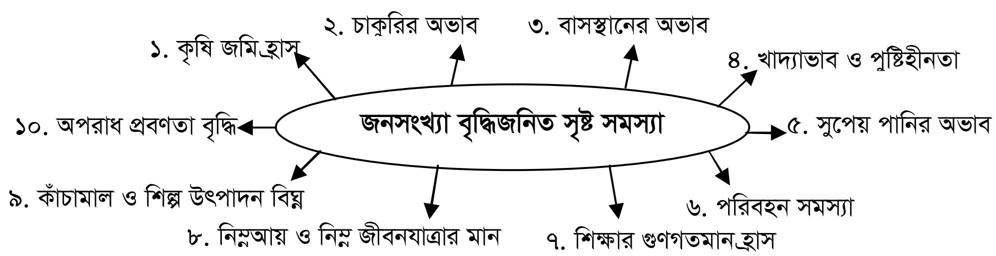

১. **কৃষি জমি হ্রাস :** দেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৬ শতাংশ। মাথাপিছু জমির পরিমাণ ০.২৪৬ একর। প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও দেশের আয়তন বাড়ছে না। অতিরিক্ত জনসংখ্যার অবকাঠামো নির্মাণে কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জমির বিভক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিমাণ কমে যাচ্ছে।

২. **চাকুরি ও কর্মসংস্থানের অভাব :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে চাকুরিতে পদ বাড়ছে না। এতে দেশে চাকুরির সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব পড়ছে।

৩. **বাসস্থানের অভাব :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাসস্থানের সমস্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাড়তি জনসংখ্যার জন্য অতিরিক্ত বাসস্থানের প্রয়োজন হয়। ফলে বাসস্থানের সংস্থান করতে গিয়ে কৃষি ও বনভূমি হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া শহরে বিপুল সংখ্যক লোক বস্তি এলাকায় ঘিঞ্জি পরিবেশে বাস করছে।

৪. **খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা :** জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধির ফলে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের সংস্থান দেশীয় উৎপাদন দ্বারা পূরণ করা দূরূহ হয়ে পড়ে। প্রতি বছর প্রচুর খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করতে হচ্ছে। বিপুল জনগোষ্ঠির পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার সংস্থান করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। এতে শিশু অবস্থা থেকে অনেকেই অপুষ্টির শিকার হয়। ফলে একটি দক্ষ জনশক্তি হিসেবে অধিকাংশ শিশু বাড়তে পারে না এবং অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়।

৫. **সুপেয় পানি অভাব :** জীবনধারণের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান পানি। উপকূলীয় অঞ্চলের লবনাক্ত পানি, আর্সেনিকযুক্ত পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, নগর এলাকায় বিশেষ করে ঢাকা ও চট্টগ্রামে জনসংখ্যার অব্যাহত চাপ

থাকায় বর্ধিত জনগোষ্ঠির জন্য সুপেয় পানি নিশ্চিত করার উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে।

৬. **পরিবহন সমস্যা :** অতিরিক্ত জনসংখ্যা দেশের পরিবহন ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করে। দেশের প্রধান কয়েকটি পরিবহন মাধ্যম যেমন- ট্রেন, বাস, লঞ্চ ইত্যাদিতে ব্যাপক চাপ পড়ে। রাজধানী ঢাকাতে অতিরিক্ত গাড়ীর কারণে যানজট লেগেই থাকে।

৭. **শিক্ষার গুণগত মান হ্রাস :** অতিরিক্ত জনসংখ্যা হলে তাদের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করা কঠিন। দেশের শিক্ষা গ্রহনকারী সংখ্যা অধিক হলে একই শ্রেণিকক্ষে এবং স্বল্প সংখ্যক শিক্ষক দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শিক্ষা দিতে হয়। এছাড়াও যত্রতত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। ফলে শিক্ষার গুণগত মানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

৮. **নিম্নআয় ও জীবনযাত্রার মান :** জনসংখ্যা যত বাড়ছে মাথাপিছু আয় তত কমছে। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বেশি হলে তাদের চাহিদা পূরণ করা অধিকাংশ লোকের পক্ষে সম্ভব হয় না। সীমিত আয় দিয়েই পরিবারের যাবতীয় চাহিদা পূরণ করতে হয়। ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠি কাঙ্খিত জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে পারে না।

৯. **কাঁচামাল ও শিল্প উৎপাদন বিঘ্ন :** বিভিন্ন প্রকার শিল্পের কাঁচামালের অন্যতম প্রধান উৎস কৃষি উৎপাদিত পণ্য। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠির বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে কৃষিযোগ্য ভূমি ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া মৌলিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে বিপুল পরিমাণ পুঁজি ব্যয় করতে হয়। ফলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও কাঁচামাল সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হয়।

১০. **অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধি :** কর্মক্ষম জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারলে অনেককে অলস সময় অতিবাহিত করতে হয়। এতে অলস জনগোষ্ঠি বিভিন্ন অপচিন্তায় জড়িয়ে পড়ে। চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি, মাদক ব্যবসাসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডে লিপ্ত হয়। ফলে অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধি পেয়ে সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হয়।

এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ না হওয়া, মুদ্রাস্ফীতি, নির্ভরশীলতা ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সমাধানের উপায়

জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক পর্যায়ে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা সমাধানে নিম্লোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. **জন্মনিয়ন্ত্রণ :** দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কোনো বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে পরিকল্পিত উপায়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণই একমাত্র উপায়। সত্তরের দশকে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের হার ছিল ৭.৩ শতাংশ যা ২০১১ সালে এসে দাঁড়ায় ৬১ শতাংশে। এই হার দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এখনও জনগোষ্ঠির একটি বড় অংশ পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে বিরত রয়েছে। তাই জন্মনিয়ন্ত্রণে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির ব্যাপক প্রচার এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সামগ্রী সহজলভ্য করা অত্যন্ত জরুরি।

২. **বাল্যবিবাহ রোধ :** আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে এবং শহুরে বস্তি এলাকায় বাল্যবিবাহের প্রচলন রয়েছে। অনেক অভিভাবকের ধারণা, ছেলে বা মেয়েকে বিয়ে দিতে পারলেই তারা নিশ্চিত। মেয়েদের ক্ষেত্রে এ ঘটনাটি বেশি দেখা যায়। তাই জনগোষ্ঠির এই অংশটিকে বাল্যবিবাহের কুফল সর্ম্পকে সচেতন করা প্রয়োজন। আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ রোধ করতে হবে।

৩. **শিক্ষা বিস্তার :** শিক্ষা মানুষকে সচেতন করে, কুসংস্কার থেকে দূরে রাখে। যদি জনগণকে শিক্ষিত করা যায় তাহলে তারা অধিক জনসংখ্যার ফলে সৃষ্ট সমস্যা সম্পর্কে পূর্বেই বুঝতে পারবে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে।

৪. **কুসংস্কার দূর করা :** সন্তান জন্মদানের বিষয়টি অনেক সময় ধর্মের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। মসজিদ, মন্দির ও গির্জার মাধ্যমে সচেতনতামূলক বক্তব্য প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতারা জনগণকে কম সন্তান নেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। ধর্মীয় নেতাদের প্রতি সমাজের সকল স্তরের মানুষের অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে।

৫. **বিলম্ব বিবাহে উৎসাহ প্রদান :** দেশে ১৯৬১ সালে মানুষের গড় আয়ু ছিল ৪৪.৭২ বছর যা ২০১৩ সালে এসে দাঁড়ায় ৭০.৭ বছর। এর মধ্যে মহিলাদের গড় আয়ু ৭১.৫ বছর এবং পুরুষদের গড় আয়ু ৬৯.৯ বছর। যেহেতু দেশের মানুষের গড় আয়ু অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে সেহেতু বিলম্বে বিবাহে উৎসাহিত করতে হবে। এতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে অগ্রগতি হবে।

৬. **জনসংখ্যার সুষম বন্টন :** বাংলাদেশের জনসংখ্যা সর্বত্র সমভাবে বণ্টিত নয়। যেসব এলাকায় জনবসতি কম সেসব এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে জনসংখ্যা আকৃষ্ট করতে হবে।

৭. **চিকিৎসা :** শিশু মৃত্যুহার অধিক হলে পিতা-মাতা অধিক সন্তান কামনা করে। এজন্য শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে অবহেলিত জনগোষ্ঠির ক্ষেত্রে তা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে অভিভাবকগণ একটি বা দুইটি সন্তানেই সন্তুষ্ট থাকে। বাংলাদেশ চিকিৎসাক্ষেত্রে ইতোমধ্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে।

৮. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সুষম আয় :** বেকার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে তারা কর্মের দিকে মনোনিবেশ করবে। বেকার জনগণকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে হবে। এছাড়া দেশের জাতীয় আয় মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে যেন আটকে না থাকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এ ধরনের অবস্থায় ধনী আরও ধনী এবং গরীব আরও গরীব হবে। তাই আয়ের সুষম বন্টনে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

৯. **অভিবাসন :** দেশের মোট জনগোষ্ঠির একটি বিরাট অংশ কর্মক্ষম এবং বিদেশ যেতে ইচ্ছুক। এরূপ আগ্রহী ব্যক্তিদের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে তারা দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে।

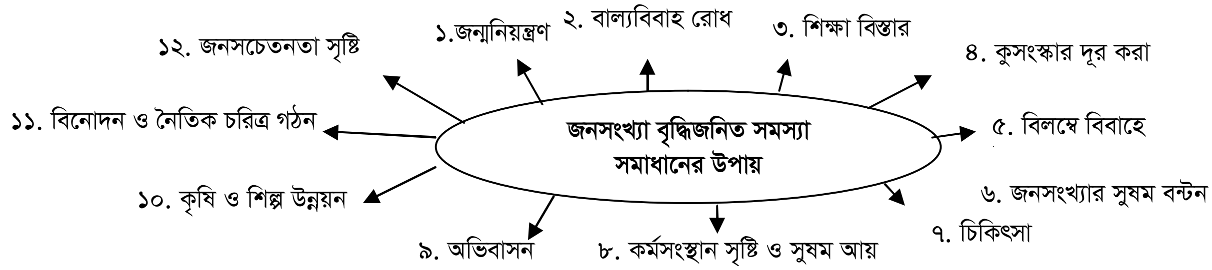

১০. **কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন :** দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৭.৩০ শতাংশ কৃষিতে এবং মাত্র ১৭.৬৪ শতাংশ শিল্পে নিয়োজিত। তাই কৃষি এবং শিল্প ক্ষেত্রের উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এতে জাতীয় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে। ফলে জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে অধিক সচেতন হবে এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারবে।

১১. **বিনোদন ও নৈতিক চরিত্র গঠন:** শহর কিংবা গ্রাম উভয় জায়গাতেই বিনোদনের ব্যবস্থা দিন দিন সংকুচিত হয়ে যাওয়ার ফলে বিবাহিত জীবনকে বিনোদনের একমাত্র উপায় হিসেবে অনেকে মনে করে। তাই পর্যাপ্ত বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া নৈতিক চরিত্র উন্নত হলে অসামাজিক কার্যকলাপ দূরীভূত হবে। এজন্য প্রতিটি ধর্মের নৈতিক শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই প্রদান করতে হবে যাতে নৈতিক চরিত্র দৃঢ় হয়।

১২. **জনসচেতনতা সৃষ্টি :** অধিক জনসংখ্যার কুফল এবং প্রভাব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। এক্ষেত্রে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক প্রচার মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারি এবং বেসরকারি উভয় পর্যায়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি মানুষের অধিক সন্তান গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে। এছাড়াও সামাজিকভাবে নানা ধরনের প্রচারনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়ে তা লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

জনসংখ্যা আমাদের দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানব সম্পদ। দেশের উন্নয়নের জন্য যেমন জনসংখ্যা প্রয়োজন ঠিক তেমনি বর্ধিত জনসংখ্যার ফলে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয়। বর্ধিত জনসংখ্যার ফলে সৃষ্ট সমস্যার মধ্যে রয়েছে কৃষি জমি হ্রাস, কর্মসংস্থানের অভাব, বাসস্থানের অভাব, খাদ্যাভাব ও পুষ্টিহীনতা, সুপেয় পানি অভাব, পরিবহন সমস্যা, শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি। একই সাথে আমাদের দেশের এই বর্ধিত জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের জন্যও বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। জন্ম নিয়ন্ত্রণ, বাল্যবিবাহ রোধ, শিক্ষা বিস্তার, কুসংস্কার দূরীভূতকরণ, জনসংখ্যার সুষম বন্টন, অভিবাসন, কৃষি ও শিল্পোন্নয়ন, প্রশিক্ষণসহ দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমেই অতিরিক্ত জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। এ লক্ষ্যে সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশে প্রতি বর্গকিলোমিটারে কতজন লোক বাস করে?
(ক) ৮৭৪ জন (খ) ১০২৮ জন (গ) ১২৫০ জন (ঘ) ১২৬০ জন

২. বাংলাদেশের আয়তন পৃথিবীর ৩ হাজার ভাগের?
(ক) একভাগ (খ) দুইভাগ (গ) তিনভাগ (ঘ) চারভাগ

৩. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে হয়-
i. কৃষি জমি হ্রাস ii. খাদ্যাভাব iii. কর্মসংস্থানের অভাব
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii

৪. জনসংখ্যাকে কীভাবে দক্ষ করা যায়?
(ক) প্রশিক্ষণ (খ) শিক্ষা (গ) সচেতন (ঘ) সবগুলো

পাঠ-৬.৭ অভিবাসন ও প্রকারভেদ (Migration and Types)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অভিবাসন বলতে কী বুঝায় তা জানতে পারবেন এবং
- অভিবাসনের প্রকারভেদ বলতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	অভিবাসন, অবাধ অভিবাসন, বলপূর্বক অভিবাসন, অন্ত:রাষ্ট্রীয় অভিবাসন, আন্তর্জাতিক অভিবাসন।

অভিবাসন

আমরা যদি আমাদের চারপাশে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, প্রতিনিয়ত মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গমন করছে। যেমন- জীবিকা নির্বাহ, চাকুরি, চিকিৎসা, বিনোদন, হাট-বাজার প্রভৃতি কারণে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটে যাচ্ছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে মানুষ নিজের আবাসস্থল পরিবর্তন করে অন্যত্র গিয়ে বসবাস করছে। সাধারণত মানুষের বাসস্থানের এরূপ স্থায়ী বা অস্থায়ী পরিবর্তনকে অভিবাসন বলা হয়ে থাকে।

জাতিসংঘের মতে, "এক বা একাধিক বছরের জন্য বাসস্থানের পরিবর্তনকে অভিবাসন বলে"।

বিশেষজ্ঞগণের মতে, "বাসস্থানের স্থায়ী বা অস্থায়ী পরিবর্তনকে অভিবাসন বলে"।

সুতরাং আমরা বলতে পারি, অভিবাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হলো বাসস্থান পরিবর্তন যা স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোনোটিই হতে পারে।

অভিবাসনের প্রকারভেদ (Types of Migration)

পাঠ ৬.১ এ আমরা জেনেছি জনসংখ্যা পরিবর্তনের একটি অন্যতম উপায় হলো অভিবাসন। এই অভিবাসন বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। নিম্নের ছকে অভিবাসনের প্রধান শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো।

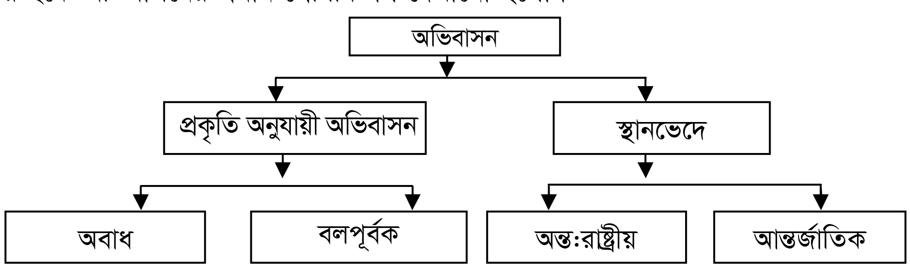

ক. প্রকৃতি অনুযায়ী অভিবাসন : প্রকৃতি অনুযায়ী অভিবাসন দুই প্রকার। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

১. অবাধ অভিবাসন (Free Migration) : অনেক সময় আমরা নিজেদের পছন্দমতো জায়গায় গিয়ে বসবাস করি। যখন নিজের ইচ্ছায় আবাসস্থান ত্যাগ করে অন্য কোনো পছন্দমতো স্থানে আবাস গড়ে তোলা হয় তখন তাকে অবাধ অভিবাসন বলে। মানুষ যে স্থান পরিত্যাগ করে তাকে **উৎসস্থল** (Place of Origin) এবং নতুন যে স্থানে গমন করে সে স্থানকে **গন্তব্যস্থল** (Place of Destination) বলে। উৎস স্থানের বিভিন্ন অভাব, অসুবিধা এবং গন্তব্যস্থলের অধিক সুযোগ-সুবিধা এ ধরনের অভিবাসনের মূল কারণ। যেমন- আমাদের দেশের অনেক লোক শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি সুবিধার জন্য বিভিন্ন জেলা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়ে থাকে।

২. বলপূর্বক অভিবাসন (Forced Migration) : প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সামাজিক চাপের কারণে মানুষ বাধ্য হয়ে যদি তার আবাসস্থান পরিবর্তন করে অন্যত্র আবাস গড়ে তোলে তখন তাকে বলপূর্বক অভিবাসন বলে। উদাহরণস্বরূপ, ইরাক যুদ্ধের ফলে কয়েক লক্ষ লোক নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পার্শ্ববর্তী দেশসহ বিভিন্ন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। এ ধরনের অভিবাসনের ফলে যে সমস্ত ব্যক্তি কোনো স্থানে আগমন করে এবং স্থায়ী আবাস স্থাপন

করে তাদেরকে **উদ্বাস্তু** (Refugee) বলে। আর যারা সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সুবিধামত সময়ে নিজ দেশে ফিরে যায় তাদের বলা হয় **শরনার্থী** (Emigree)।

খ. স্থানভেদে অভিবাসন : স্থানভেদেও অভিবাসন প্রধানত দুই প্রকার। নিম্নে স্থানভেদে অভিবাসনের প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো।

১. অন্তঃরাষ্ট্রীয় অভিবাসন(Intrastate Migration) : একটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে যখন কোনো ব্যক্তি স্থানান্তরিত হয় তখন তাকে অন্তঃরাষ্ট্রীয় অভিবাসন বলে। যেমন- পঞ্চগড় থেকে কেউ যদি ঢাকায় এসে বসবাস করে তখন তাকে অন্তঃরাষ্ট্রীয় অভিবাসন বলে। অন্তঃরাষ্ট্রীয় অভিবাসনকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নের ছকে তা দেখানো হলো।

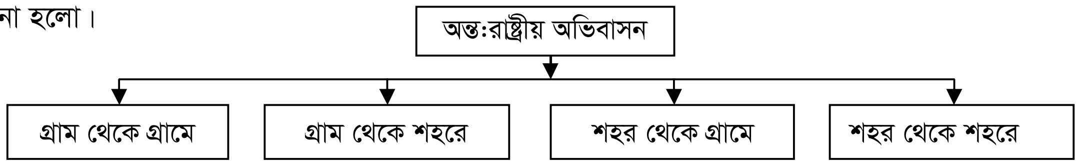

ক. **গ্রাম থেকে গ্রামে (Rural to Rural) :** একই দেশের অভ্যন্তরে যখন কোনো মানুষ এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে স্থানান্তরিত হয় তখন তাকে বলা হয় গ্রাম থেকে গ্রামে অভিবাসন। পুরুষের তুলনায় মহিলাদের এ ধরনের অভিগমন বেশি করতে দেখা যায়। এর কারণ মহিলারা স্বল্প দূরত্বে যেতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। বৈবাহিক কারণেও মহিলারা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে অভিগমন করে থাকে।

খ. **গ্রাম থেকে শহরে (Rural to Urban)** : একই রাষ্ট্রে গ্রামীন এলাকা থেকে যখন কোনো ব্যক্তি শহরে স্থানান্তরিত হয়ে বসবাস করে তখন তা গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন। একই রাষ্ট্রীয় সীমানায় সাধারণত গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলোতে এ ধরনের অভিবাসন প্রবনতা বেশি দেখা যায়।

গ. **শহর থেকে গ্রামে (Urban to Rural) :** শহর থেকে কোনো মানুষ যখন গ্রামে স্থানান্তরিত হয়ে বসবাস করে তখন তাকে শহর থেকে গ্রামে অভিবাসন বলে। আমাদের দেশে এ ধরনের অভিবাসন খুব কম দেখা যায়। তবে উন্নত দেশগুলোতে এ ধরনের অভিবাসন দেখা যায়।

ঘ. শহর থেকে শহরে (Urban to Urban) : একই দেশের অভ্যন্তরে এক শহর থেকে যখন অন্য শহরে গিয়ে বসবাস করে তখন তাকে শহর থেকে শহরে অভিবাসন বলে। সাধারণত চাকুরি, উন্নত জীবনযাত্রা প্রভৃতি কারণে এ ধরনের অভিবাসন বেশি দেখা যায়।

২. আন্তর্জাতিক অভিবাসন (International Migration) : কোনো দেশের নাগরিক যখন তার নিজ দেশের রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম করে অন্য দেশে বাস করে তখন তাকে আন্তর্জাতিক অভিবাসন বলে। এক্ষেত্রে একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সীমানা অতিক্রম অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মানুষ ইচ্ছা করলেই আন্তর্জাতিক অভিবাসন করতে পারে না। কারণ এ ধরনের অভিবাসনের একটি নীতি রয়েছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, বাংলাদেশ, ভারত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশ ও অঞ্চলের মধ্যে। আন্তর্জাতিক অভিবাসন আবার দুই প্রকার। যথা-

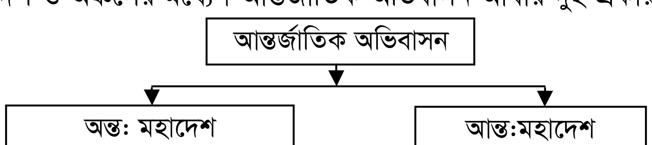

ক. **অন্তঃমহাদেশ (Intra Continent Migration)** : একই মহাদেশভুক্ত এক দেশ থেকে যখন অন্য মহাদেশে গমন করে বসবাস করে তখন তাকে অন্তঃমহাদেশ অভিবাসন বলে। যেমন- এশিয়া মহাদেশের বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ায় অভিবাসন।

খ. আন্তঃমহাদেশ (Inter Continental Migration) : কোনো একটি মহাদেশ থেকে যখন অন্য মহাদেশে দেশে গিয়ে বসবাস করে তখন তাকে আন্তঃমহাদেশ অভিবাসন বলে। যেমন-এশিয়া মহাদেশের বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের জার্মানিতে অভিবাসন।

এই পাঠে আমরা অভিবাসন এবং এর প্রকারভেদ সম্পর্কে জানলাম। পরের পাঠে বাংলাদেশের অভিবাসনের কারণ সম্পর্কে জানব।

শিক্ষার্থীর কাজ	কোনটি কোন ধরনের অভিবাসন উল্লেখ করুন।

অভিবাসন	অভিবাসনের ধরণ
পঞ্চগড় → ঢাকা	
বাংলাদেশ → মালয়েশিয়া	
এশিয়া → ইউরোপ	

সারসংক্ষেপ :

মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য গমন করে থাকে। এরূপ এক বা একাধিক বছরের জন্য বাসস্থানের পরিবর্তনই অভিবাসন। প্রকৃতি অনুযায়ী অবাধ ও বলপূর্বক এ দুই ধরনের অভিবাসন হতে পারে। আবার স্থানভেদে অন্ত:রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন হতে পারে। অভিবাসনের আবার বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। যে ধরনের অভিবাসনই হোক না কেন অভিবাসনের ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল বা দেশের জনসংখ্যার আকারগত পরিবর্তনের ওপর প্রভাব পড়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. প্রকৃতি অনুযায়ী অভিবাসন কত প্রকার?

(ক) ২ (খ) ৩
(গ) ৪ (ঘ) ৫

২. নিচের কোনটি আন্তর্জাতিক অভিবাসন?

(ক) গ্রাম থেকে শহর (খ) শহর থেকে শহর
(গ) শহর থেকে গ্রাম (ঘ) মহাদেশ থেকে মহাদেশ

৩. অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের উদাহরণ-

i. ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ii. চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা iii. বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i, ii ও iii

৪. বলপূর্বক অভিবাসন হয়ে থাকে কোনটির কারণে?

(ক) অনুন্নত জীবনযাপন (খ) গৃহযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক বৈষম্য
(গ) রাজনৈতিক অস্থিরতা (ঘ) উন্নত চিকিৎসা

পাঠ-৬.৮ বাংলাদেশের অভিবাসনের কারণ
(Causes of Migration in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অভিবাসনের আকর্ষণ ও বিকর্ষণজনিত উপাদান জানবেন;
- বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের কারণ বলতে পারবেন এবং
- আন্তর্জাতিক অভিবাসনের কারণ জানবেন।

	মূখ্য শব্দ	অভিবাসনের আকর্ষণজনিত উপাদান, অভিবাসনের বিকর্ষণজনিত উপাদান, অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের কারণ, আন্তর্জাতিক অভিবাসনের কারণ।

অভিবাসনের কারণ

আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঐতিহাসিকভাবেই মানুষ তার আবাসস্থল পরিবর্তন করে আসছে। সাধারণভাবে সকল মানুষই জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি কামনা করে। অভিবাসন প্রক্রিয়ায় একদিকে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদান হিসেবে লক্ষ্যস্থানের সুযোগ-সুবিধা, অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ইত্যাদি আকর্ষণ করে। অপরদিকে উৎসস্থানে সুযোগ-সুবিধার অনুপস্থিতি, অসন্তোষ, অস্থিরতা বা দুর্যোগজনিত অবস্থা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ দুইটি বিপরীতমুখী অবস্থাকে যথাক্রমে আকর্ষণ (Pull) এবং বিকর্ষণ (Push) অর্থাৎ Push-Pull উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আকর্ষণ এবং বিকর্ষণজনিত উপাদানগুলো অভিবাসনকে প্রভাবিত করে থাকে। তবে এসব উপাদান সর্বত্র সমানভাবে বিরাজমান নয়। নিম্নে অভিবাসনের আকর্ষণ এবং বিকর্ষণজনিত উপাদানগুলো উল্লেখ করা হলো।

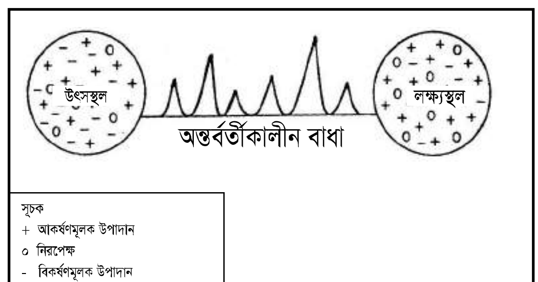

চিত্র-৬.৮.১ : অভিবাসনের আকর্ষণ-বিকর্ষণজনিত সম্পর্ক

অভিবাসনের আকর্ষণজনিত উপাদান (Pull factors of Migration):

১. ভালো চাকুরি
২. বেশি আয়ের সুযোগ
৩. উন্নত জীবনযাপনের সুযোগ
৪. ব্যবসা-বাণিজ্য
৫. বিবাহ বন্ধন
৬. নতুন নতুন প্রযুক্তি
৭. ধর্মীয় তীর্থস্থান
৮. উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ এবং
9. নতুন সংস্কৃতি ইত্যাদি।

অভিবাসনের বিকর্ষণজনিত উপাদান (Push factors of Migration):

১. অর্থনৈতিক মন্দা
২. কর্মসংস্থানের অভাব
৩. সঞ্চিত সম্পদ হ্রাস
৪. অধিক জনসংখ্যা
৫. সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা
৬. ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমাগত ক্ষয়ক্ষতি
৭. পারিবারিক অশান্তি
৮. চাকুরি থেকে অবসর এবং
৯. নিজ সমাজ থেকে বহিস্কার বা হত্যার হুমকি ইত্যাদি।

উপরিউক্ত আকর্ষণ এবং বিকর্ষণজনিত কারণে বাংলাদেশেও অভিবাসন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের অভিবাসনের ধরণ অনুযায়ী কারণগুলোকে দুইভাগে ভাগ করে আলোচনা করতে পারি।

ক. অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের কারণ (Causes of Internal Migration)

আমাদের দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রয়োজনে মানুষ একস্থান থেকে অন্যস্থানে বিশেষ করে গ্রাম থেকে শহরে, শহর থেকে

শহরে গিয়ে অস্থায়ী বা স্থায়ী আবাস গড়ে তুলছে। এছাড়া গ্রাম থেকে গ্রামে, শহর থেকে গ্রামে গিয়েও সীমিত পরিসরে বাস করতে দেখা যায়। যে সকল কারণে এসব অভ্যন্তরীণ অভিবাসন ঘটছে তা নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো।

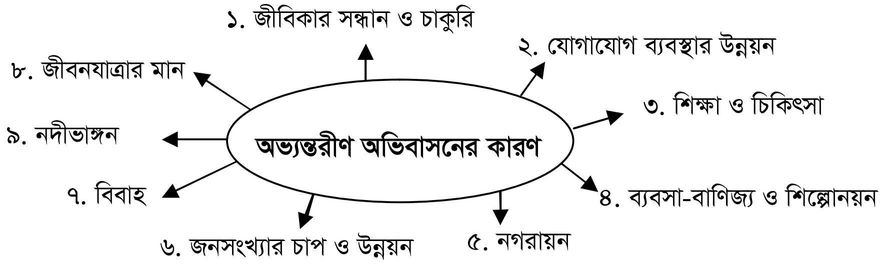

১. **জীবিকার সন্ধান ও চাকুরি :** আমাদের দেশে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের অন্যতম কারণ জীবিকার সন্ধান। মানুষ প্রতিনিয়ত গ্রাম থেকে বড় বড় শহরে বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ প্রভৃতি শহরে জীবিকার সন্ধানে ছুটছে। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি চাকুরিজনিত কারণে অভিবাসনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে চাকুরিতে বদলির কারণে মানুষ একস্থান থেকে অন্যস্থানে গিয়ে বসবাস করছে।

২. **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন :** যেসব এলাকায় পরিবহন ও অন্যান্য যোগাযোগ মাধ্যম উন্নত সেসব এলাকায় মানুষ বেশি গমন করে থাকে। আবার চরাঞ্চল বা পাহাড়ি দুর্গম অঞ্চলে অভিবাসন প্রক্রিয়া নেই বললেই চলে। কিন্তু এসব এলাকার লোকজন বসবাসের জন্য শহরে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থায় অধিক স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকে যা অভিবাসনে সহায়ক। একই সাথে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের কারণে মানুষ সহজেই বিভিন্ন এলাকার সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে অবগত হয়ে সেসব এলাকায় গমন করে থাকে।

৩. **শিক্ষা ও চিকিৎসা :** অভ্যন্তরীণ অভিবাসনে শিক্ষার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই সন্তানের শিক্ষার জন্য গ্রাম থেকে উপজেলা বা জেলা শহরে এমনকি বিভাগীয় শহর অথবা রাজধানীতে গমন করছে। অতি সম্প্রতি এই প্রক্রিয়াটি অধিক মাত্রায় পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাদের দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থায় উন্নত চিকিৎসা সেবা এখনো জনগণের দোঁরগড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ফলে যে সকল পরিবারে অসুস্থ বা বয়স্ক নাগরিক **(Senior Citizen)** রয়েছেন সেসব পরিবারে সার্বক্ষণিক চিকিৎসা সুবিধার জন্য শহরে গমন করার প্রবনতা দেখা যায়।

৪. **ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পোন্নয়ন :** দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। একই সাথে বহুমুখী ব্যবসার প্রসার ঘটছে। ফলে মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসার এবং পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্রের আশেপাশে আবাস গড়ে তুলছে। এছাড়া শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে শিল্পায়িত এলাকায় কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মানুষ ছুটে আসছে। ফলে শিল্পায়িত এলাকায় অভিবাসন প্রক্রিয়া দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. **নগরায়ন :** বাংলাদেশে নগরায়ন প্রক্রিয়া খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষ সহসাই গ্রামীন এলাকা থেকে নগরে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে আবাস গড়ে তুলছে।

৬. **জনসংখ্যার চাপ ও নিম্নআয় :** দেশে বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার **১.৩৬%**। আয়তনের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হওয়ায় মাথাপিছু কৃষি জমি হ্রাস পাচ্ছে। এতে কর্মসংস্থানহীন জনগণের একটি অংশ অন্যত্র গমন করছে। এছাড়া নিম্ন আয়ের মানুষ অধিক আয়ের আশায় শহরে গমন করে থাকে।

৭. **বিবাহ :** বিবাহজনিত কারণেও অভিবাসন হয়ে থাকে। দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মের তাগিদে বা আত্মীয়-স্বজন অথবা অন্য কোনো মাধ্যমে পরিচয়ের সূত্র ধরে এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে গিয়ে বিবাহ করছে। ফলে বিবাহজনিত কারণে বিশেষ করে মহিলাদের অভিবাসনের হার বাড়ছে।

৮. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন :** গ্রামের তুলনায় শহরে জীবনযাত্রার মান উন্নত। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার প্রায় সব সুবিধাই শহরে পাওয়া যায়। এক শ্রেণির মানুষ তাদের আরো উন্নত জীবনযাত্রার তাগিদ অনুভব করায় অভিগমন করে থাকে।

৯. **নদীভাঙ্গন :** বর্তমানে আমাদের দেশে অভিবাসনের একটি অন্যতম নদীভাঙ্গন। নদীভাঙ্গনের ফলে প্রতিবছর অনেকে সহায়-সম্বল হারিয়ে শহরে অভিগমন করছে।

খ. আন্তর্জাতিক অভিবাসনের কারণ (Causes of International Migration)

বাংলাদেশের অভিবাসনের একটি অন্যতম দিক আন্তর্জাতিক অভিবাসন। আন্তর্জাতিক অভিবাসন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অভিবাসনের বিভিন্ন কারণও রয়েছে। নিম্নে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের প্রধান কারণগুলো তুলে ধরা হলো।

১. **অর্থনৈতিক ও কর্মসংস্থান :** আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক অভিবাসনের অন্যতম কারণ অর্থনৈতিক। অনেক পরিবারের সদস্যই উন্নত ও স্বচ্ছল জীবনযাপনের প্রত্যাশায় বিদেশে পাড়ি জমায়। তাছাড়া দেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দূরুহ। অপরদিকে মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় আন্তর্জাতিক অভিবাসন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২. **চাকুরি :** অনেকে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন চাকুরির সুযোগে বিদেশ গিয়ে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।

৩. **উচ্চশিক্ষা :** আমাদের দেশে শিক্ষার হার দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশে গমন করছে। অনেকেই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে সে দেশেই চাকুরির ব্যবস্থা করে নাগরিকত্বও অর্জন করছে।

৪. **যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন :** বিশ্বের প্রতিটি দেশে আজকাল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। যেমন- পরিবহন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট প্রভৃতি প্রযুক্তির উৎকর্ষতার কারণে অন্য দেশে অবস্থান করলেও সহজেই পরিবার পরিজনের সাথে যোগাযোগ করতে পারে যা আন্তর্জাতিক অভিবাসনের অন্যতম কারণ।

৫. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** জনসংখ্যা বৃদ্ধিও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের কারণ। খাদ্যের চাহিদা বৃদ্ধি, কৃষি জমি হ্রাসসহ বিভিন্ন মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেকে বিদেশে গমন করতে বাধ্য হয়।

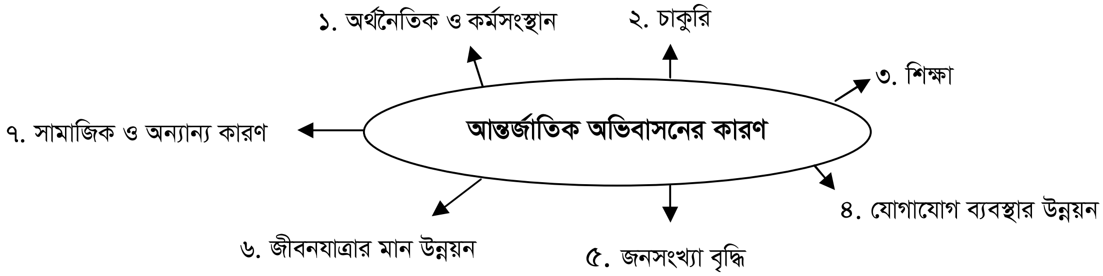

৬. **জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন :** বর্তমানে অনেকে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অভিগমন করে থাকে।

৭. **সামাজিক ও অন্যান্য কারণ :** আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক অভিবাসনের কিছু সামাজিক কারণও রয়েছে। আত্মীয়-স্বজন বিদেশে অবস্থান, বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত সমাজ ব্যবস্থাসহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণেও আন্তর্জাতিক অভিবাসন হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকা থেকে যারা অভিবাসন করেছেন তার কারণগুলো বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ :

মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদেই একস্থান হতে অন্যস্থানে গমন করে থাকে। এই গমনের পিছনে উৎসস্থলের নেতিবাচক উপাদান এবং গন্তব্যস্থলের আকর্ষণমূলক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে- জীবিকার সন্ধান, চাকুরি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোনটি অভিবাসনের আকর্ষণজনিত উপাদান?
(ক) ভালো চাকুরি (খ) অর্থনৈতিক মন্দা
(গ) অধিক জনসংখ্যা (ঘ) পারিবারিক অশান্তি

২. অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের কারণ-
i. শিক্ষা ii. চিকিৎসা iii. নগরায়ন
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii

৩. আন্তর্জাতিক অভিবাসনের সামাজিক কারণ কোনটি?
(ক) আত্মীয়-স্বজন বিদেশে অবস্থান (খ) নগরায়ন
(গ) নিম্নআয় (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৬.৯ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভিবাসীদের অবদান
(Contribution of Migrants in the Economy of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রবাসীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ বলতে পারবেন;
- প্রবাসীদের শ্রেণিভিত্তিক আকার জানবেন এবং
- অভিবাসীদের কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জানতে পারবেন ।

	মূখ্য শব্দ	রেমিটেন্স, শ্রেণিভিত্তিক অভিবাসী।

অর্থনীতিতে অভিবাসীদের অবদান

আমাদের দেশের অর্থনীতিতে অভিবাসীদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অভিবাসনের ফলে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বেকার সমস্যা হ্রাস, দারিদ্র বিমোচন এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। দেশের অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ফলে অর্থনীতিতে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক অভিবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ অর্থনীতির ভিতকে মজবুত করছে।

অভিবাসীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থ

আমাদের দেশের অধিকাংশ অভিবাসীই সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর প্রভৃতি দেশে কর্মরত। এছাড়া জর্ডান, লেবানন, বাহরাইন, দক্ষিণ কোরিয়া, যুক্তরাজ্য, ব্রুনাই প্রভৃতি দেশে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী রয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৩ লক্ষ ৮২ হাজার প্রবাসী ছিল যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৯ হাজারে পৌঁছায়। সারণি-৬.৯.১ এ বিগত কয়েক বছরের প্রবাসী বাংলাদেশের সংখ্যা দেখানো হলো-

সারণি-৬.৯.১ : প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা, প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	কর্মজীবির সংখ্যা (হাজার)	প্রেরিত অর্থ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০০৫-০৬	৩৮২	৪৮০১.৮৮
২০০৬-০৭	৮৩৩	৫৯৭৮.৪৭
২০০৭-০৮	৮৭৫	৭৯১৪.৭৮
২০০৮-০৯	৪৭৫	৯৬৮৯.১৬
২০০৯-১০	৪২৭	১০৯৮৭.৪০
২০১০-১১	৪৩৯	১১৬৫০.৩২
২০১১-১২	৬৯১	১২৮৪৩.৪০
২০১২-১৩	৪৪১	১৪৪৬১.১৫
২০১৩-১৪	৪০৯	১৪২২৮.৩০

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৫, পৃ.৩১

শ্রেণিভিত্তিক অভিবাসী

বাংলাদেশ থেকে পেশাজীবি, দক্ষ, আধা দক্ষ, স্বল্পদক্ষ জনশক্তি বিদেশে গমন করে থাকে। সারণি-৬.৯.২ অনুযায়ী বাংলাদেশের শ্রেণিভিত্তিক অভিবাসীর সংখ্যা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, স্বল্পদক্ষ অভিবাসীর সংখ্যাই অধিক যা মোট অভিবাসীর অর্ধেকেরও বেশি। পেশাজীবির সংখ্যা সবচেয়ে কম।

সারণি-৬.৯.২ : শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

সাল	পেশাজীবি	দক্ষ	আধা-দক্ষ	স্বল্পদক্ষ	মোট
২০০৫	১৯৪৫	১১৩৬৫৫	২৪৫৪৬	১১২৫৫৬	২৫২৭০২
২০০৬	৯২৫	১১৫৪৬৮	৩৩৯৬৫	২৩১১৫৮	৩৮১৫১৬
২০০৭	৬৭৬	১৬৫৩৪৪	১৮৩৭৫৪	৪৮২৮৩৫	৮৩২৬০৯
২০০৮	১৮৬৪	২৮১৪৪৪	১৩২৮১০	৪৪৭৩৩৮	৮৭৫০৫৫
২০০৯	১৪২৬	১৩৪২৬৫	৭৪৬০৪	২৫৫০৭০	৪৭৫২৭৮
২০১০	৩৮৭	৯০৬২১	১২৪৬৯	২৮৭২২৫	৩৯০৭০২
২০১১	১১৯২	২২৯১৪৯	২৮৭২৯	৩০৮৯৯২	৫৬৮০৬২
২০১২	৮১২	২০৯৩৬৮	২০৪৯৮	৩৭৭১২০	৬০৭৭৯৮
২০১৩	৬৮৯	১৩৩৭৫৪	৬২৫২৮	২১২২৮২	৪০৯২৫৩
২০১৪	১৭৩০	১৪৮৭৬৬	৭০০৯৫	১৯৩৪০৩	৪২৫৬৮৪

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৫, পৃ.৩৩

অভিবাসীদের কল্যাণে গৃহীত পদক্ষেপ

দেশের অর্থনীতিতে অভিবাসীদের গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. **জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর কল্যাণ শাখা :** জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীন একটি বিশেষ সেবাধর্মী শাখা হলো কল্যাণ শাখা। এই শাখা বিদেশগামী জনশক্তিকে তথ্য প্রদান, বিমানবন্দরে নিরাপদে গমন ও প্রত্যাবর্তন, বিদেশে আটকে পড়া জনশক্তি ফেরৎ আনার ব্যবস্থা, অসুস্থতা বা যে কোনো ধরনের সমস্যায় বাংলাদেশী নাগরিকদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করে থাকে।

২. **বহির্গমণ প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন :** অভিবাসীদের সুবিধার্থে প্রতিনিয়ত ডিজিটাল পদ্ধতিতে বহির্গমণ প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন করা হচ্ছে। বিদেশগামীদের যাবতীয় তথ্য ডাটাবেজ এ সংরক্ষণ করে স্মার্ট কার্ডের সাহায্যে বহির্গমণ ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে।

৩. **অনলাইন সুবিধা :** দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সকল বিদেশগামী কর্মীদের সুবিধার্থে নিবন্ধন প্রক্রিয়া অনলাইনে করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বল্প খরচে সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিদেশ যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

৪. **প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন :** যে সকল ব্যক্তি বিদেশে যেতে আগ্রহী তাদেরকে ঋণ প্রদান অথবা বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করে তাদের পুন:কর্মসংস্থানের সহায়তা দিতে ওয়েজ আর্নাস কল্যাণ তহবিলের অর্থায়নে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক নামে এই বিশেষায়িত্ত ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

৫. **শ্রমবাজার সন্ধান ও সম্প্রসারণ :** বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অভিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান বিবেচনা করেই নতুন নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধান করা হচ্ছে। নতুন শ্রমবাজার হিসেবে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, সুইডেন, পাপুয়া নিউগিনি, সুদান, গ্রীস, কঙ্গো, তানজানিয়া, লাইবেরিয়া, আলজেরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশকে চিহ্নিত করা হয়েছে। একই সাথে বিদ্যমান শ্রমবাজার সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন

বেসরকারি রিক্রুটিং এজেন্সী শ্রমবাজার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া ইতোমধ্যে যারা বিদেশে অবস্থান করছেন তাদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকেও বিদেশে কর্মসংস্থানের চেষ্টা করছেন। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভিবাসীদের অবদান দেশের অর্থনীতির ভিতকে মজবুত করার পাশাপাশি অন্যান্য আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অভিবাসীদের অবদান তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ :

বাংলাদেশের অধিকাংশ অভিবাসীই সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার, ওমান, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর প্রভৃতি দেশে কর্মরত। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এসব অভিবাসীদের অবদান অপরিসীম। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ এদেশের অর্থনীতির ভিতকে মজবুত করেছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির অন্যতম মাধ্যম রেমিটেন্স। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৪৮০১.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স প্রেরণ করে যা ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৪২২৮.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছায়। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে তা কয়েকগুণ বেড়েছে। বাংলাদেশ থেকে পেশাজীবি, দক্ষ, আধা দক্ষ, স্বল্পদক্ষ জনশক্তি বিদেশে গমন করেন। এসব প্রবাসী বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন দেশে বাংলাদেশের প্রবাসী রয়েছে?
(ক) সৌদি আরব (খ) সংযুক্ত আরব আমিরাত
(গ) মালয়েশিয়া (ঘ) সবগুলো

২. অভিবাসনের ফলে হয় -
i. দারিদ্র বিমোচন
ii. বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি
iii . কর্মসংস্থান
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii

৩. প্রবাসীদের কল্যাণে কোন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে?
(ক) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক (খ) রূপালী ব্যাংক
(গ) জনতা ব্যাংক (ঘ) সোনালী ব্যাংক

৪. বাংলাদেশের অভিবাসীদের মধ্যে রয়েছে-
i. দক্ষ ii. আধা দক্ষ iii . স্বল্পদক্ষ iv. পেশাজীবি
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) iii ও iv (ঘ) i, ii, iii ও iv

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

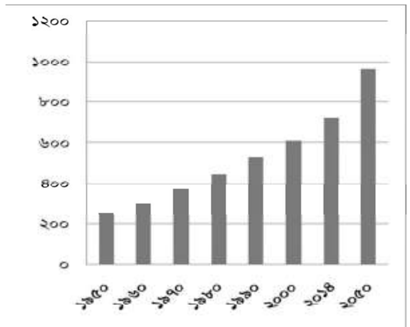

ক. কোন সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ৬ বিলিয়ন হয়?

খ. বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারাকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

গ. চিত্রে উল্লিখিত ১৯৫০ এবং ২০৫০ সালের জনসংখ্যার মধ্যে অধিক পার্থক্য কেন? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. পৃথিবীকে বিভিন্ন জনসংখ্যা অঞ্চলে বিভক্ত করে আলোচনা করুন।

১নং প্রশ্নের নমুনা উত্তর

ক. বিশ্বের জনসংখ্যা ৬ বিলিয়নে পৌঁছে ১৯৯৯ সালের ১২ অক্টোবর।

খ. বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো-

১. প্রাথমিক পর্যায় (প্রাচীনকাল থেকে ১৬৫০ সাল)

২. মাধ্যমিক পর্যায় (১৬৫০ সাল থেকে ১৯০০ সাল) এবং

৩. আধুনিক পর্যায় (১৯০০ সাল থেকে বর্তমান)।

গ. চিত্রে উল্লিখিত ১৯৫০ সাল এবং ২০৫০ সালের প্রাক্কলিত জনসংখ্যার মধ্যে অধিক ব্যবধান দেখা যায়। এর মূল কারণ হলো উনিশ শতকের শুরুর পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিবর্তন হতে থাকে। ১৯৫০ সালের পর থেকে মানুষের মৌলিক চাহিদা বিশেষ করে খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি পূরণ সহজ হয়ে যায়। কৃষি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানেও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে, যা বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূল নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। ১৯৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা ছিল ২৫১.৯ কোটি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৫০ সালে বিশ্বের জনসংখ্যা হবে ৯৬২.৪ কোটি। এ কারণে উদ্দীপকে উল্লিখিত গ্রাফে ১৯৫০ এবং ২০৫০ সালের জনসংখ্যার ব্যবধান এত বেশি দেখা যাচ্ছে।

ঘ. পৃথিবী পৃষ্ঠের সকল অঞ্চলে জনসংখ্যা সমভাবে বন্টিত নয়। কোথাও রয়েছে বিপুল মানুষের সমাগম আবার কোথাও বা প্রায় জনমানবহীন। তাই পৃথিবীকে জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক থেকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যথা-

১. নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল

২. পরিমিত জনসংখ্যা অঞ্চল

৩. বিরল জনসংখ্যা অঞ্চল এবং

৪. প্রায় জনহীন অঞ্চল ।

নিম্নে বিভিন্ন জনসংখ্যা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত এলাকাগুলো আলোচনা করা হলো।

১. **নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল :** বিশ্বের যেসব অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ১০০ জনের বেশি লোক বাস করে সেগুলোই হলো নিবিড় জনসংখ্যা অঞ্চল। বাংলাদেশ, ভারত, চীন, ইন্দোনেশিয়া, যুক্তরাজ্য, জাপান, জার্মান প্রভৃতি দেশ এর অন্তর্ভুক্ত।

২. **পরিমিত জনসংখ্যা অঞ্চল :** যেসব অঞ্চলে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৫০-১০০ জন লোক বাস করে সেসব অঞ্চলকে পরিমিত জনসংখ্যা অঞ্চল বলে। যেমন- তুরস্ক, ইরাক, ইরান, যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ স্থান, আফ্রিকার পূর্ব-উপকূল, চীনের উচ্চভূমি।

৩. **বিরল জনসংখ্যা অঞ্চল :** কোনো অঞ্চলে যদি প্রতি বর্গকিলোমিটারে ২-৫০ জন লোক বাস করে তবে সেই অঞ্চলকে বিরল জনবসতি অঞ্চল বলে। উত্তর আমেরিকার প্রেইরি, দক্ষিণ আমেরিকার পম্পাস, ইউরেশিয়ার স্টেপস এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. **প্রায় জনহীন অঞ্চল :** বিশ্বের কিছু কিছু অঞ্চল রয়েছে যেখানে প্রায় জনহীন। এসব এলাকায় বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার কারণে প্রতি বর্গকিলোমিটারে একজনেরও কম লোক বাস করে। এ ধরনের অঞ্চলগুলোই প্রায় জনহীন অঞ্চল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আফ্রিকার সাহারা ও কালাহারি মরুভূমি, আমাজান উপত্যকা, হিমালয়, রকি ও আন্দিজ পর্বতমালা এ ধরনের অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক নিয়ামকের ভিন্নতার কারণে বিশ্বের জনসংখ্যা সর্বত্র সমান নয়। এজন্য বিশ্ব জনসংখ্যার আকার অনুযায়ী পৃথিবীকে কয়েকটি জনসংখ্যা অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে।

- **উপরের সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তরের আলোকে নিম্নের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর লেখার চর্চা করুন।**

সৃজনশীল প্রশ্ন -২

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্টাডি সেন্টারের ভূগোল ও পরিবেশের টিউটোরিয়াল ক্লাসে টিউটর মি. হাসান বাংলাদেশের মানচিত্রটি শিক্ষার্থীদের দেখিয়ে বললেন যে, আয়তনের তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা অনেক বেশি। ফলে আর্থ-সামাজিকসহ সকল ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ছে। তাই তিনি অতিরিক্ত জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন উপায়ের ওপর গুরুত্বারোপ করলেন।

ক. বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা কত?

খ. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণগুলো কী কী?

গ. বাংলাদেশের গ্রামীন ও শহুরে জনসংখ্যার একটি তুলনামূলক চিত্র আলোচনা করুন।

ঘ. বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে করণীয় সর্ম্পকে আপনার সুচিন্তিত মতামত দিন।

সৃজনশীল প্রশ্ন -৩

আমেরিকা বিভিন্ন সময়ে সে দেশে বসবাসের জন্য ডিভি লটারির মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সুযোগ দেয়। কবির ও সালমা দম্পতি ২০০৮ সালে অনুরূপ ডিভি লটারির মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে আমেরিকা গমন করে এবং সেখানে বর্তমানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।

ক. অভিবাসন কী?

খ. কবির ও সালমা দম্পতি কোন ধরনের অভিবাসনের পর্যায়ে পড়ে?

গ. কবির ও সালমা দম্পতি অভিবাসনের ফলে বাংলাদেশে কী ধরনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "আকর্ষণ ও বিকর্ষণমূলক কারণই অভিবাসন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।" – উক্তিটি ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১ :	১. গ	২. ঘ	৩. ঘ	৪. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২ :	১. ক	২. গ	৩. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩ :	১. ক	২. ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪ :	১. খ	২. ঘ	৩. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫ :	১. খ	২. গ	৩. ক	৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬ :	১. খ	২. ক	৩. গ	৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭ :	১. ক	২. ঘ	৩. ক	৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮ :	১. ক	২. গ	৩. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৯ :	১. ঘ	২. গ	৩. ক	৪. ঘ